দাজ্জাল কি আসছে

আসরার আলম

দাজ্জাল কি আসছে?

মূল ঃ আসরার আলম

অনুবাদ ঃ গোলাম সুবহান সিদ্দিকী

দাজ্জাল কি আসছে?

মূল ঃ আসরার আলম

অনুবাদ ঃ গোলাম সুবহান সিদ্দিকী

প্রকাশনায় ঃ

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগাল এইড বাংলাদেশ

৩৮০/বি, মিরপুর রোড

(সোনালী ব্যাংক লালমাটিয়া শাখার উপরে)

ঢাকা-১২০৯। ফোন ঃ ৯১৩১৭০৫

প্রকাশ কাল ঃ

বৈশাখ, ১৪০৯ সাল

সফর, ১৪২৩ হিজরী

মে, ২০০২ ঈসায়ী

মূল্য ঃ ৭০.০০ টাকা মাত্র

কম্পোজ ঃ

নাবীল কম্পিউটার্স

৪৯১, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা

ফোন ঃ ৯৩৩৪১৮২

মূদ্রণ ঃ

আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস

মগবাজার, ঢাকা

মুখবন্ধ

আল্লাহ্র প্রশংসা এবং দরুদ ও সালামের পর- শেষ যামানার নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) এর উম্মত মানব জাতির মধ্যে সেই সর্বশেষ উম্মত, যাকে সমগ্র মানব জাতির তত্ত্বাবধায়কের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছে। তাই এখন গোটা মানব জাতির সাফল্য নির্ভর করছে এই সর্বশেষ উম্মতের উপর।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে যে, সর্ব শেষ উম্মত মানব ইতিহাসের সেই পর্যায়ে প্রবেশ করেছে, যে পর্যায় সম্পর্কে অবহিত করতে গিয়ে মহানবী (স) বলেন: অনতিবিলম্বে নানা জাতি তোমাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ার জন্য ডাক দেবে, যেমন ডাক দেয় ক্ষুধার্ত (জন্তু) খাবার পানে ছুটে আসার জন্য। (আবু দাউদ, বায়হাকী)

এহেন বেদনাদায়ক পরিস্থিতির চেয়েও বেশি উদ্বেগজনক বিষয় এই যে, মুসলিম উম্মাহ, যে কিনা দুনিয়ার একমাত্র দল যাকে অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের যথেষ্ট পরিমাণ জ্ঞান দান করা হয়েছে, আজ তারা অবাক উদভ্রান্ত হয়ে পথের সন্ধানে দিক বিদিক ছুটে বেড়াচ্ছে এবং দুনিয়ার অন্ধকারের নিকট থেকে আলো ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে। চৌদ্দ শতাব্দী পর এখন কিয়ামতের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার গতি তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে বলে অনুভূত হচ্ছে। এই গতিকে মালা ছিঁড়ে একের পর এক দানা ঝরে পড়ার গতির সঙ্গে তুলনা করা যায়।

এহেন পরিস্থিতির আলোকে, কুরআন মজীদ এবং হাদীস শরীফের আলোকে উম্মতের পরিস্থিতি গভীর ভাবে পর্যালোচনা করা, ইতিহাসের পট পরিবর্তনের ধারাকে সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করা এবং ভবিষ্যতের জন্য কর্মসূচী চিহ্নিত করা উচিত ছিল, যাতে মুসলিম উম্মাহ তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে ও গোটা মানবতাকে সফলতার পথে নিয়ে যেতে পারে। এ বিষয়গুলো সম্মুখে রেখে এই পুস্তকখানি ও অনুরূপ আরো কিছু পুস্তক রচনার কাজ শুরু করা হয়েছে, যাতে নানা বিষয় বিভিন্ন শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করি তিনি এ প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং তাতে বরকত দান করুন। নি:সন্দেহে তিনি সর্বশ্রোতা, প্রার্থনা মঞ্জুরকারী এবং অত্যন্ত নিকটবর্তী।

আসরার আলম

ভূমিকা

১৯১৭ সালের সেপ্টম্বর মাস থেকে বিশ্বে বিদ্যুৎ গতিতে এমন সব পরিবর্তন দেখা দিতে এবং এমন এমন বিরল ঘটনা ঘটতে থাকে, যাতে মানুষ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যায়। ১৯৯৯ থেকে সে সব ঘটনা ঘটার গতি আরো তীব্রতর হয়। পরিস্থিতির নাজুকতা আমাকে মুসলিম উম্মার সম্মুখে একটা তাৎক্ষণিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করতে বাধ্য করে। তা যতই ক্ষুদ্র আর অকিঞ্চিৎকর হোক না কেন। বর্তমান পুস্তকে সে তাৎক্ষনিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

এ পুস্তকের প্রথমাংশ এর মৌল বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বিষয়টা আরো স্পষ্ট করার জন্য আরো দুটি নিবন্ধ পরিশিষ্ট হিসাবে এর সঙ্গে সংযুক্ত করা হচ্ছে। এ দু'টি নিবন্ধের একটি উপ সাগরীয় যুদ্ধ ঃ অন্তর্নিহিত রহস্য ও পরিণতি এপ্রিল ১৯৯৯- এ প্রকাশিত এবং অপরটি ইবলীসের নূতন ফন্দি মে ১৯৯৯ - প্রকাশিত।

আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করছি তিনি যেন এ প্রচেষ্টা কবুল করেন এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল করেন। যে সব ব্যক্তি এ পুস্তক প্রণয়নে আমাকে সহায়তা করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও উত্তম প্রতিদান দান করুন। তিনি উত্তম অভিভাবক ও উত্তম সাহয্য দাতা।

আসরার আলম

সূচীপত্র

পর্বতের পশ্চাতে সৈন্য*

জ্ঞানীদের মতে সৃষ্টি জগতের সবচেয়ে বড় ঘটনা এবং নিশ্চিত ভাবেই যা ছিল বিশ্ব সৃষ্টির চেয়েও বড় ঘটনা সেদিন সংঘটিত হয়, যখন এই পৃথিবীতে সরওয়ারে কায়েনাত ফখরে মওজুদাত হযরত মুহাম্মাদকে (স) শেষ যমানার নবী ও খাতামুন নাবিয়্যীন করে প্রেরণ করা হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করা ছিল আল্লাহর পরিকল্পনার মূল কথা। সমস্ত নবী রসূলইতো নবুওয়াত ও রিসালাতের ভাষায় কথা বলতেন, কিন্তু মাহনবীর বাণী স্থান-কাল-পাত্রের গণ্ডিও অতিক্রম করে গেছে। নবুওয়াত লাভের পর তিনি মানব জাতির সম্মুখে প্রথম ভাষণ দেন। আপন নবুওয়াতের ঘোষণা দেয়া এবং সর্বশেষ নবী প্রেরণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার নিমিত্ত তিনি সাফা পর্বতে আরোহন করেন। কুরাইশদের মাধ্যমে সেদিনের প্রথম ভাষণে তিনি গোটা বিশ্ববাসীকে সম্বোধন করেন। সেই ভাষণে মহানবী (স) জানালেন,

"أرأيتكم ان اخبرتكم ان خيلا تخرج من صفح هذا الجبل"

'তোমাদের কী মনে হয়, আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে, পর্বতের ওপার থেকে এক দল সৈন্য বেরিয়ে আসছে?' অপর এক বর্ণনায় আছে

"ان خيلا تخرج بالوادى"

'একটা অশ্বারোহী বাহিনী উপত্যকায় আবির্ভূত হতে যাচ্ছে।' তিনি আরো বললেন,

"تريد ان تغير عليكم أ كنتم مصدقى؟"

'সে সৈন্য দল তোমাদের উপর হামলা চালাতে চায়-তোমরা কি আমার এ বক্তব্য সত্য বলে মেনে নেবে?'

লোকেরা জানায়:

"نعم ما جربنا عليك الا صدقا"

'হ্যাঁ, আমরা মেনে নেবো, কারণ, অভিজ্ঞতা দ্বারা আমরা জানতে পেরেছি যে, আপনি অসত্য কোন কথা বলেন না।'

তখন মহানবী বললেন :

"فانى نذكر لكم بين يدى عذاب شديد"

---

* প্রকাশ কাল ২৭ এপ্রিল ১৯৯৯, মুতাবিক ১০ মহররম ১৪২০ হিজরী।

'জেনে রাখ, আমি (সৈন্য দলের) কঠোর শাস্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছি।'

এই ভাষণের মাধ্যমে মহানবী (স) এই মর্মে খবর দেন যে, নবী হিসাবে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে। মহানবী (স) সমস্ত নবী রসূলদের নেতা এবং সমন্বয়কারী ছিলেন। নিজের বক্তব্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মহানবী (স) বলেন, 'সত্যপন্থীদের ভয়ংকর পরীক্ষার যে আশংকা সমস্ত নবী রসূলদের ছিল, সে মহাবিপদ তাঁদের সময়ে প্রকাশ পায়নি, মনে হচ্ছে এখন তা প্রকাশ পাবে।' তিনি বলেন,

(১) "مابين خلق آدم الى قيام الساعة امر اكبر من الدجال"-

'আদমের সৃষ্টি থেকে কিয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের আবির্ভাবের চেয়ে বড় কোন ঘটনা নেই।' (মুসলিম)

(২) "ما من نبى الا قد أنذر امته الاعور الكذاب" -

'এমন কোন নবী ছিলেন না, যিনি তাঁর উম্মতকে মিথ্যাবাদী কানা দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি।' (বুখারী, মুসলিম)

তাইতো মহানবী (স) তাঁর উম্মতকে সতর্ক করতঃ বলেন,

ان يخرج وانا فيكم فانا حجيجه دونكم وان يخرج ولست فيكم فامرئ حجيج نفسه والله خليفتى على كل مسلم -

'আমি তোমাদের মধ্যে অবস্থান কালে যদি তার আবির্ভাব ঘটে, তবে আমি তাকে প্রতিরোধ করবো। কিন্তু আমার অবর্তমানে তার আবির্ভাব ঘটলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের দায়িত্ব নিতে হবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানের সুরক্ষার ব্যবস্থা করবেন।' (মিশকাত)

লক্ষণাদি থেকে মনে হচ্ছে মহানবী (স) যে হামলাকারী সেনা দল এবং যে বিপদের খবর দিয়েছিলেন, অদূর ভবিষ্যতে তা প্রকাশ পাবে। ভাব-সাব আর লক্ষণ থেকে মনে হচ্ছে, কিয়ামতের চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রথমাংশ যে ১৯৯২ থেকে শুরু হয়ে গেছে। মনে হয়, সর্বশেষ পর্যায়ের পাঁচটি বড় অংশ রয়েছে। আর সর্বশেষ পর্যায় যে ১৯৯৯ থেকে শুরু করে ১ শ থেকে ৩ শ বৎসর পর্যন্ত প্রলম্বিত হতে পারে। এ শেষ পর্যায়ের প্রথমাংশ যে ১৯৯৯ থেকে ২০-৩০ বৎসর প্রলম্বিত হতে পারে। আল্লাহ তা'য়ালাই ভালো জানেন। কিয়ামতের জ্ঞান কেবল তাঁর কাছেই আছে।

উল্টা গণনা

ভাব-সাব আর লক্ষণ এদিকে ইঙ্গিত করছে যে, উল্টা গণনা শুরু হয়ে গেছে। তাই কিয়ামতের শেষ পর্যায়ের প্রথমাংশ নিম্নোক্ত ক্রমানুসারে প্রকাশ পাবে। এই মাত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই পর্যায় যে ১৯৯৯ থেকে শুরু করে ২০ বৎসর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। অর্থাৎ সে সময়টা যে ১৯৯৯ থেকে শুরু করে ২০১৯ সাল বা সর্বোচ্চ ২০৩০ সাল পর্যন্ত প্রলম্বিত হতে পারে। এই অংশে এমন চারটি অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটবে, যা গোটা বিশ্বকে ওলট-পালট আর লন্ডভন্ড করে দিতে পারে। কারণ এ চারটি ঘটনা পর্যায়ক্রমিক প্রতিক্রিয়ার আকার ধারণ করতে পারে। এই চারটি ঘটনার দু'টি ধারাবাহিকতা যুক্তিগ্রাহ্য বলে প্রতিভাত হচ্ছে।

প্রথম ধারাবাহিকতা

১. ইসরাইল সরকার সামরিক অভিযান চালিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসসহ গোলান উপত্যকা, গাজা অঞ্চল গ্রাস করে অবিভক্ত জেরুসালেমকে ইসরাইল রাষ্ট্রের রাজধানী করতে পারে।

২. কুব্বাতু ছাখরা ও সমস্ত মুসলিম পবিত্র স্থানসহ মসজিদে আকসাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারে।

৩. ইসরাইল তার মিত্রদের সহায়তায় সিরিয়া, লেবানন, জর্দান, ইরাক, সউদী আরব, মিশর, ইয়ামন, কুয়েত, আরব আমীরাত এবং ওমানের বিরাট অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অধিকার করে নিতে পারে।

৪. তুরস্ক, ইরাক, পাকিস্তান, উজবেকিস্তান, দাগেস্তান, তুর্কমানিস্তান, আজার বাইজান, চেচনিয়া, তাতারিস্তান, আফগানিস্তান, কিরগিজিস্তান, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সুদান, লিবিয়া, আলজেরিয়া, তিউনিশিয়া, মরক্কো, মৌরিতানিয়া, নাইজার, নাইজেরিয়া, চাঁদ, উগান্ডা, সোমালিয়া ইত্যাদি দেশের উপর ইসরাইল এবং তার বন্ধু রাষ্ট্র হামলা পরিচালনা করে রাষ্ট্রগুলোকে সমূলে ধ্বংস করার চেষ্টা চালাতে পারে।

দ্বিতীয় ধারাবাহিকতা

১. হঠাৎ একদিন কোন ইসরাইলী শক্তি কর্তৃক ডিনামাইট আক্রমণ দ্বারা মসজিদে আকসাকে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা চালানো।

২. এর প্রতিক্রিয়ার অজুহাতের আশ্রয় নিয়ে ইসরাইল সরকারের সামরিক

অভিযান পরিচালনা করা এবং পশ্চিম তীর, গোলান এবং গাজা অধিকার করে নেয়া, বায়তুল মুকাদ্দাসের সমস্ত ইসলামী স্মৃতিচিহ্ন মুছে ফেলার চেষ্টা চালানো এবং অবিভক্ত জেরুসালেমকে ইসরাইল রাষ্ট্রের রাজধানী করা।

৩. এর প্রতিক্রিয়া ঠেকানোর জন্য লেবানন, সিরিয়া, জর্দান, ইরাক, সউদী আরব, মিসর, ইয়ামান, কুয়েত, আরব আমিরাত এবং ওমানের বিরাট অংশ ইসরাইল এবং তার মিত্ররা দখল করে নেবে।

৪. এর প্রতিক্রিয়া ঠেকানোর জন্য তুরস্ক, ইরান, পাকিস্তান, তাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, দাগেস্তান, তুর্কমানিস্তান, আজারবাইজান, চেচনিয়া, তাতারিস্তান, আফগানিস্তান, কিরগিজিস্তান, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সুদান, লিবিয়া, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো, মৌরিতানিয়া, নাইজার, নাইজেরিয়া, চাদ, উগান্ডা, সোমালিয়া ইত্যাদি দেশের উপর ইসরাইল এবং তার মিত্রদের অভিযান পরিচালনা করে এসব দেশকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার চেষ্টা চালানো।

গাশ এমোনিম

বেথেলহামের দক্ষিণাঞ্চলে কেফের সায়ন্থন (Kfar Etzion) গ্রামে, যা জেরুসালেম-হেবরন রোডে অবস্থিত ১৯৭৪ সালের মে মাসে রাভজিভি ইহুদাকক (Rav Zvi Yehudakook) দ্বারা এ শেষ পর্যায়ের হামলার সূচনা হলেও কয়েকটি কারণে আমি এখনো তাকে Under ground বলে মেনে নিতে বাধ্য। ১৯৯৯ সালের মে থেকে উদ্ভব ঘটা নিশ্চিত। এই প্রচেষ্টার নাম গাশ এমোনিম (Gush Emonim)। মে ১৯৯৯ সালের পর 'গাশ এমোনিম 'এর বিশ্বাস, চিন্তাধারা, লক্ষণ উদ্দেশ্য গোটা বিশ্ব ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রকাশ্য বিশ্বাস আর লক্ষণ উদ্দেশ্যের রূপ পরিগ্রহ করবে। এভাবে একটা অপ্রকাশিত পর্যায় প্রকাশিত হয়ে পড়বে। এ প্রেক্ষিতে মে ১৯৯৯ যে গুরুত্ব লাভ করে এবং বারবার যার দিকে ইঙ্গিত করা হয়, তার কারণ নিম্নরূপঃ

১. বিশ্ব ইহুদীবাদ শেষ পর্যন্ত এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, হযরত ইয়াসইয়া যে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, যা বংশানুক্রমে তাদের মধ্যে মুখে মুখে উচ্চারিত হয়ে আসছে, তা পূর্ণতার স্তরে পৌঁছার সময় উপস্থিত হয়েছে।

২. বিগত তিন বৎসর থেকে যথা নিয়মে এ জন্য কাজ শুরু হয়েছে।

৩. সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ থেকে এর প্রতিক্রিয়া রোধ করে সমস্ত কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পন্ন করার নিমিত্ত একটা বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু হয়েছে। এর ফল বিশ্ববাসীর সম্মুখে দেখা দিয়েছে কসোভো সংকটের আকারে। ইহুদীরা এখন সফলতার সঙ্গে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে।

অবশ্য পরিস্থিতি প্রথম ধারাবাহিকতার দিকে আগাবে, না দ্বিতীয় ধারাবাহিকতার দিকে, সে কথা বলার সময় এখনো আসেনি। তবে ভালো ভাবে তাকালে উভয় ক্রমধারার মধ্যে পার্থক্য কেবল ১ম এবং ২য় নাম্বারে বর্ণিত ঘটনা আগে বা পরে ঘটার ক্ষেত্রে। এ কারণে কোন্ ঘটনা আগে সংঘটিত হবে আর কোন্ ঘটনা পরে, এই বিতর্ক খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ নয়, অর্থাৎ কোন্ ঘটনা কোন্ ঘটনার পরিণতি আর প্রতিক্রিয়া-এ বিষয়টা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিষয়টা এজন্য গুরুত্বহীন যে, এখন এই গোটা পরিকল্পনাটাই ইহুদীদের সর্বসম্মত পরিকল্পনায় পরিণত হয়েছে। অপর দিকে এর প্রতিক্রিয়ার ফলাফল নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ইহুদীবাদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অগ্রসরও হয়েছে। এর স্পষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে বলকান ফ্রন্টের (Balkan Theatre) নামে তৈরি করা বর্তমান মোর্চা।

মূলতঃ এ সূক্ষ্ম তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করার জন্য এ পর্যালোচনাটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। এ পর্যালোচনায় একথা জানার চেষ্টা করা হয়েছে যে, বেসরকারী ভাবে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হলে কি কি সহায়ক প্রভাব প্রতিক্রিয়া (Collateral Effects) দেখা দিতে পারে। এ হচ্ছে সেই গোপন পরিকল্পনার সর্বাধিক গোপন পর্যালোচনা, আজ থেকে ১২ বৎসর পূর্বে যা পরিচালনা করে আন্তর্জাতিক বিষয়ক হার্ভার্ড সেন্টার (The Harvard Centre for International Affairs)। এই গোপন অভিযান ও ঘৃন্য ষড়যন্ত্রের সর্বশেষ গভীরতা সম্পর্কে জানেন ইসরাইলী বিশেষজ্ঞ জিডিয়ন এ্যারন (Gideon Aran)। তিনি পূর্ণ পর্যালোচনা চালিয়ে বলেনঃ

"The heads of the Underground estimated that the

bombing of the 'abomination' would arouse hundreds of millions of Muslims to a Jihad, sweeping all mankind into an ultimate confrontation. This they interpreted as the War of Gog and Magog. with Cosmic implications. Israel's victorious emergence from this longed for -trial by fire would then pave the way for the coming of the Messiah"

(Gideon Aran, 'Jewish Zionist fundamantalism: the bloc of the faithful in Israel (Gush Emunim)', unpublished communications. folio 5 as quoted by La Revanche de Dieu by Gelles Kepel, Editions du seuil 1991).

"গুপ্ত কর্মকর্তাদের ধারণা যে, এহেন 'কদর্য কর্ম' অর্থাৎ মসজিদে আকসাকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার মানে কোটি কোটি মুসলমানকে জিহাদের পথে ঠেলে দেয়া, যা শেষ পর্যন্ত গোটা মানবতাকে একটা বড় যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেবে। এহেন বড় যুদ্ধকে তিনি ইয়াজুজ মাজুজের যুদ্ধ বলে অভিহিত করেন। গোটা বিশ্বে এ যুদ্ধের আত্মিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। আগুন নিয়ে খেলার এই যুদ্ধে ইসরাইলের বিজয়ীর বেশে বের হওয়া পৃথিবীর বুকে মসীহের আগমনের পথ উন্মুক্ত করবে।"

ইহুদী ভবিষ্যদ্বাণী

সন্দেহ নেই যে, ইহুদীদের গোটা ইতিহাস তানাক (TANAK) এর যিহিস্কেল অধ্যায়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এসব আয়াতকে স্বয়ং ইহুদীরা নিজেদের ব্যাখ্যা আর বিকৃতিমূলক অপকর্ম দ্বারা নিজেদের জন্য যে স্থায়ী বিপদে পরিণত করে নিয়েছিল, সে ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই। যিহিস্কেল রুকু ৩৬ আয়াত ২৪-২৮ এ যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে তাদের বিকৃত মানস সর্বদা এর কদর্থ করেছে এবং তারা হয়েছে সবচেয়ে বেশী পাষাণ হৃদয়। এমন কি হযরত ঈসা (আ) কে অস্বীকার করার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্বের সেই আসন থেকে চিরতরে অপসারণ করেন।

কিন্তু তাদের বিকৃত মানসিকতা অদ্যাবধি তাদেরকে সেই ভ্রান্ত ধারণায় বন্দী করে রেখেছে। যিহিস্কেল এর অন্যান্য আয়াত, যা ইহুদীদেরকে আরো পাগল করে রেখেছে, তা হচ্ছে ৩৮ এবং ৩৯ রুকু। ৩৮ রুকুর ১ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

"আমি জাতিগণের মধ্য হইতে তোমাদিগকে গ্রহণ করিব, দেশসমূহ হইতে তোমাদিগকে সংগ্রহ করিব, ও তোমাদেরই দেশে তোমাদিগকে উপস্থিত করিব। আর আমি তোমাদের উপরে শুচি জল প্রক্ষেপ করিব, তাহাতে তোমরা শুচি হইবে, আমি তোমাদের সকল অশৌচ হইতে ও তোমাদের সকল পুত্তলি হইতে তোমাদিগকে শুচি করিব। আর আমি তোমাদিগকে নূতন হৃদয় দিব, ও তোমাদের অন্তরে নূতন আত্মা স্থাপন করিব, আমি তোমাদের মাংস হইতে প্রস্তরময় হৃদয় দূর করিব ও তোমাদিগকে মাংসময় হৃদয় দিব। আর আমার আত্মাকে তোমাদের অন্তরে স্থাপন করিব, এবং তোমাদিগকে আমার বিধিপথে চালাইব, তোমরা আমার শাসন সকল রক্ষা করিবে ও পালন করিবে। আর আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যে দেশ দিয়াছি সেই দেশে তোমরা বাস করিবে, আর তোমরা আমার প্রজা হইবে, এবং আমিই তোমাদের ঈশ্বর হইব।" তাই তাদের বিকৃত মানসিকতা সর্বদা এর অপব্যাখ্যা করেছে। ফলে তারা আরো বেশী পাষাণ হৃদয় হয়ে পড়ে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে অস্বীকার করার কারণে আল্লাহ্ তাআলা মর্যাদার আসন থেকে তাদেরকে চিরতরে অপসারণ করেন। কিন্তু তাদের বিকৃত মানসিকতা এখন পর্যন্ত তাদেরকে এহেন ভ্রান্ত ধারনায় বন্দী করে রেখেছে।

যিহিসকেলের অন্যান্য আয়াত যেগুলো ইহুদীদেরকে আরো পাগল করে রেখেছে সেগুলো হচ্ছে ৩৮ এবং ৩৯ রুকু। ৩৮ রুকুর ১নং আয়াতে বলা হয়েছে আর সদাপ্রভুর এই বাক্য আমার নিকট উপস্থিত হইল, হে মনুষ্য সন্তান, তুমি রোশের, মেলকের ও তূবলের অধ্যক্ষ মাগোগ দেশীয় গোগের দিকে মুখ রাখ, -------

৩৮ এবং ৩৯ রুকুতে যা কিছু বলা হয়েছে তা ইহুদীবাদকে একেবারে পাগল করে ছেড়েছে। তারা ভুলে গেছে যে, বাস্তবতা যথাস্থানে বহাল

আছে। কিন্তু তারা অপব্যাখ্যা করছে। কারণ, দৃশ্যপট পরিবর্তন হয়ে গেছে।

আধুনিক যুগে শয়তানের সাহায্য গ্রহণ করে এবং মহান আল্লাহর অভিপ্রায়কে দলিত মথিত করে ইহুদীবাদ মূলতঃ সেসব আয়াতকে কার্যকর করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অর্থাৎ শক্তির বলে প্রশান্তি অর্জন করা। (দ্রষ্টব্যঃ আসরার আলম- মুসলিম জাহানের রূহানী পরিস্থিতি, অধ্যায় ১৬)

এই পরিপ্রেক্ষিতে ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল ইহুদীদের জন্য প্রস্তুতির শতাব্দী। এবং গোটা বিংশ শতাব্দী এই লক্ষ্য অর্জনের শতাব্দী হিসাবে অতিবাহিত হয়েছে। শেষ পর্যায়ও অতিক্রান্ত হয়েছে। ইহুদীরা তাদের ধারণা মতে মাজুজের পূন্যভূমিতে পাওয়া জুজকে- যা রোশ, যে শক এবং তূবল এর বাদশাহ্- সমূলে উৎখাত করেছে। তাদের মিত্র পক্ষ পারশ্য, ইথিওপিয়া এবং লিবিয়ার বিনাশ সাধন করেছে।

এতদসংশ্লিষ্ট ইহুদী প্রচেষ্টা সম্পর্কে জানার জন্য ক্লারেন্স ই-মেসন জুনিয়র (Clarence E mason Junior) রচিত নিবন্ধ দ্রষ্টব্য। নিবন্ধটি স্থান পেয়েছে Prophecy and the Seventies গ্রন্থে ; গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন Charles Lee Feinberg: প্রকাশক The Moody Bible Institute of Chicago 1971.

কুরআন ও হাদীস

প্রসঙ্গটির এখানে ইতি টেনে আমরা দেখবো এ বিষয়ে কুরআন-হাদীসে কি হিদায়াত পাওয়া যায় এবং কুরআন হাদীসের আলোকে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কি জানা যায়।

দাজ্জাল সম্পর্কে মহানবী (স)-এর পবিত্র হাদীস ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স) দুটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে। এ সংক্ষিপ্ত রচনায় সে সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা সম্ভব নয়, সুতরাং এখানে যতটুকু দরকার কেবল ততটুকু আলোচনা করা হবে। মহানবী (স) বলেনঃ

(١) عن زينب بنت جحش ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل

عليها فزعا يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب ، فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه وحلق باصبعيه الابهام والتى تليها فقالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أ نهلك وفينا الصالحون ، قال نعم إذا كثر الخبث . (رواه البخارى ، كتاب الانبياء)

'উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা) বলেনঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন বিচলিত হয়ে আমার গৃহে আগমন করলেন। তিনি বললেনঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু। আরবদের জন্য দুর্ভোগ ও অনিষ্ট আসন্ন। আজ ইয়াজুজ-মাজুজ এর বাঁধে এতটুকু ফাটল দেখা দিয়েছে। এই বলে তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলী এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঙ্গুলীদ্বারা বৃত্ত তৈয়ার করেন (অর্থাৎ তিনি পরিমাণ জানালেন যে, এতটুকু ফাটল দেখা দিয়েছে।) হযরত যয়নব বলেন ঃ আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে নেককার লোকেরা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হবো? আল্লাহর নবী বললেন ঃ হাঁ, যখন পংকিলতা বৃদ্ধি পাবে।' (বুখারী, আম্বিয়া অধ্যায়)

(٢) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال فتح الله من درم ياجوج وماجوج مثل هذا وعقد بيده تسعين- (رواه البخارى كتاب الانبياء)

'হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (স) বলেন ঃ ইয়াজুজ-মাজুজের বাঁধে আল্লাহ এ পরিমাণ ফাটল সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি হস্ত দ্বারা ৯০ এর চিত্র করেন।' (বুখারী, আম্বিয়া অধ্যায়)

এ প্রসঙ্গে এখানে আপাততঃ কেবল এ কটা কথা বলবো ঃ

(১) ইয়াজুজ-মাজুজ প্রকাশ পাওয়ার বিষয়টা ওহির বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত।

(২) ইয়াজুজ-মাজুজ প্রকাশ পাওয়ার প্রাথমিক লক্ষন মহানবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ দিনগুলোতে দেখা দিয়েছে।

(৩) কোন রকম তর্ক-বিতর্ক ছাড়াই আমরা একথা স্বীকার করি যে,

দাজ্জালের আর্বিভাব আর নিহত হওয়ার পর ইয়াজুজ-মাজুজ আত্মপ্রকাশ করবে।

এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হোরায়রা (রা) এর একটি হাদীস আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। হাদীসটি বুখারী শরীফের কিতাবু ইস্তিবানাতিল মু'আনিদীন ওয়াল মুরতাদ্দীন ওয়া কিতালিহিম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। একই হাদীস বুখারী শরীফে কিতাবুল ফিতানেও বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আমরা তা দ্বারাও উপকৃত হবো।

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتقوم الساعة حتى تقتل فئتان دعواهما واحدة .

'হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, দুটি দল একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবেনা এবং উভয় দলের দাবী থাকবে একই।' (বুখারী)

কিতাবুল ফিতান-এ বর্ণিত হাদীসের শব্দমালা এরকম ঃ

حتى تقتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة .

'যতক্ষণ দু'টি বড় দল বড় যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে, যাদের দাবী হবে এক।'

সাধারণত: বিপুল সংখ্যক মুহাদ্দেসীন এর ধারণা এই যে, এখানে দু'দল দ্বারা হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এবং তাদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ বুঝানো হয়েছে।

এ অধম লেখক, এ মত মেনে নিতে পারছেনা নিম্নোক্ত কারণেঃ

১. হাদীসটির সম্পর্ক গোটা বিশ্ব পরিস্থিতির সঙ্গে। এ অর্থ করা হয়েছে কেবল ইসলামী সমাজকে সম্মুখে রেখে। অথচ কিয়ামতের সম্পর্ক গোটা বিশ্বের পরিস্থিতির সঙ্গে। সবকিছু এর অন্তর্ভুক্ত।

২. হযরত আলী এবং মু'আবিয়া (রা)-এর মধ্যকার যুদ্ধকে দুটি বড় ফিতনা বলা দুনিয়ার যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাসে বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছুই নয়।

৩. مقتلة عظيمة তথা বড় যুদ্ধ আক্ষরিক বর্ণনা নয়, বরং মর্মগত বর্ণনা বলে মনে হয়। তাকে আক্ষরিক বর্ণনা মেনে নেয়া হলেও কেবল একটা

যুদ্ধের ঘটনাকেই তার লক্ষ্য বলে স্থির করা ঠিক নয়। একাধিক যুদ্ধ বা একের পর এক যুদ্ধের ধারাও এর অর্থ হতে পারে। تقتتل তথা যুদ্ধ করবে শব্দটা সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। ঘটনাক্রমে দু'টি দলের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া এবং দু'দলের একবার লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হওয়া অর্থেও শব্দটার প্রয়োগ হতে পারে। কিন্তু এক্ষত্রে একাধিক বা একের পর এক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ইঙ্গিত বেশী পাওয়া যায়। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ، وأتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه وبروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاءالله مااقتتلوا،ولكن الله يفعل مايريد–

'এই রাসূলগণ, তাদের মধ্যে কাকেও কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন, যার সঙ্গে আল্লাহ্ কথা বলেছেন এবং কাকেও উচ্চমর্যাদায় উন্নীত করেছেন। মরিয়াম তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দান করেছি এবং রূহুল কুদুস তথা পবিত্র আত্মা দ্বারা তাকে শক্তিশালী করেছি। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আসার পর তাদের পরবর্তীগণ পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হতোনা। কিন্তু তারা পরস্পর মতভেদে জড়িয়ে পড়লো। ফলে তাদের কতক ঈমান আনলো আর কতক কুফরী করলো, কিন্তু আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা-ই করেন ।' (বাকারাঃ ২৫৩)

হাদীসের অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারী (دعواهما واحدة) এর নিম্নোক্ত অর্থ ব্যক্ত করেছেনঃ

(١) المراد بالدعوة الاسلام على القول الراجح .

'সর্বোত্তম মত অনুযায়ী দাবীর অর্থ ইসলাম।'

(٢) وقيل المراد اعتقاد كل منهما على الحق وصاحبه على الباطل بحسب اجتهادهما .

'আবার কেউ কেউ বলেন ঃ এর অর্থ হলো - উভয়ের বিশ্বাস ছিল এই যে,

সে-ই সত্যের উপর আছে এবং তার প্রতিপক্ষ মিথ্যার উপর। আর এ ব্যক্তব্য ছিল তাদের উভয় পক্ষের ইজতিহাদ অনুযায়ী।'

এ প্রসঙ্গে প্রথম কথা এই যে, دعواهما واحدة তথা তাদের উভয়ের দাবী এক-এ কথার এ অর্থ গ্রহণ করা যে, তাদের উভয়ের দাবী এক ছিল- ঠিক নয়। মহানবী (স) এর যবান থেকে এমন কথা নিঃসৃত হতে পারেনা। দ্বিতীয় বিষয় প্রসঙ্গে বলা যায়, এতে হযরত আলী ও মুআবিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। দুনিয়ার যেকোন বিরোধ সৃষ্টির সূচনা থেকে তার এই একই রূপ ছিল। বিরোধে দু'টি পক্ষ থাকে এবং বিরোধ সম্পর্কে উভয় পক্ষের দাবীও থাকে একই আর উভয় পক্ষ নিজেকে সত্যপন্থী এবং অপর পক্ষকে বাতিল পন্থী বলে মনে করে থাকে।

আসলে دعواهما واحدة কথাটা যুদ্ধরত দলগুলোর, একটা গুরুত্বপূর্ণ আলামত হিসাবে বলা হয়েছে। আর আলামত সর্বদা-ই এমন বস্তু হয়ে থাকে, যা স্পষ্ট করে চিহ্নিত করে পৃথক করে কোন সমাবেশে কোন ব্যক্তির পরিচয়ের জন্য এমন কথা বলা যেমন লোকটির নাক আছে, নিছক বাতুলতা মাত্র। অবশ্য লোকটির নাক কাটা, লম্বা বা বোঁচা এমন কথা বলা একটা চিহ্ন হতে পারে। তাদের উভয়ের দাবী এক হবে, دعواهما واحدة এর এরূপ অর্থ করাও বাতুলতা। বরং এর অর্থ হচ্ছে দুনিয়ায় সাধারনত যুদ্ধবাজ পক্ষ বিরোধী এবং দুশমন হয়ে থাকে : কিন্তু এ দু'টি বড় দল হবে সকলের চেয়ে পৃথক ও স্বতন্ত্র। এই দু'টি বিরোধী দল প্রতিপক্ষের আকারে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হবে। তাদের মধ্যে বিরাট যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হবে। কিন্তু উভয় পক্ষের লক্ষ্য, মৌলিকতা ও মূলতত্ত্ব হবে একই। গোটা বিশ্বে সংঘটিত তাবৎ যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে এই পরিচয়ই তাকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করবে। এরা হবে একে অপরের দুশমন ও বিরোধী। এদের মধ্যে সাংঘাতিক রক্তপাত সংঘটিত হবে, কিন্তু তারা কাজ করবে একই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের জন্য।

সুতরাং আমার ক্ষুদ্র মতে এ হাদীসের বক্তব্য হযরত আলী ও হযরত মুআ'বিয়ার সংঘাত কিছুতেই হতে পারেনা।

মানব ইতিহাসের কোন ঘটনার প্রতি যদি এটি প্রযোজ্য হয়, তবে তা হচ্ছে

ইহুদীদের সৃষ্ট মতবাদ থিসিস, এন্টিথিসিস এবং সিন্থিসিস। সাধারণত এটাবের হেগেলের তত্ত্ব বলে চালানো হয়। এটা হচ্ছে এমন একটি মতবাদ, যার কারণে প্রথম মহাযুদ্ধ এবং পরবর্তীকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল। অতঃপর তা হয় শীতল যুদ্ধের কারণ। মানব ইতিহাসে এ দু'টি যুদ্ধকে বিশ্বযুদ্ধ বলা যায়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, এ দু'টি যুদ্ধের দু'টি প্রতিপক্ষই ছিল একই শ্রেণীর দু'টি অঙ্গ। এদের parent Body বা মাতৃ-পিতৃদেহ এক অর্থাৎ বিশ্ব ইহুদী কংগ্রেস। উচ্চ পর্যায় উভয়ে একই উদ্দেশ্যের নিমিত্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। আর তাদের প্রয়োজন যখন তীব্র হয়, তখন পরস্পর মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়। এর সবচেয়ে উজ্বল প্রমাণ ১৯৩৯ সালে জার্মানীর বিরুদ্ধে এবং বৃটেনের পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধ ঘোষণা করা, বাহ্য চিন্তার দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক সরকারের উচিত ছিল জার্মানীর সমাজতান্ত্রিক সরকারকে সমর্থন এবং সহায়তা করা। কিন্তু তা না হয়ে বরং হয়েছে এর বিপরীত।

সুতরাং আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় একই দাবীর প্রবক্তা দু'টি বড় দলের মধ্যে সংঘটিত সেই যুদ্ধ ছিল বিংশ শতাব্দীতে দুটি পরস্পর বিরোধী ইহুদী দলের মধ্যে সংঘটিত বিশ্বযুদ্ধ। এরপর উভয় শক্তির মধ্যে শুরু হয় শীতল যুদ্ধ, আর এই শীতল যুদ্ধের একটা ছিল থিসিস, অন্যটা এন্টিথিসিস এবং এর উদ্দেশ্য ছিল সিনথিসিসকে সামনে নিয়ে আসা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এক দিকে বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালী, রাশিয়া এবং আমেরিকা ছিল তথাকার ইহুদীদের ক্রীড়নক; অপর পক্ষে জার্মানী, অষ্ট্রিয়া এবং তুরস্ক ছিল নিজ নিজ অঞ্চলের ইহুদীদের ক্রীড়নক। এই যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করা হয়। বাহ্যত: দু'পক্ষের মধ্যে একটা পক্ষ পরাজিতও হয়েছে এবং অপর পক্ষ হয়েছে বিজয়ী। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, উভয় পক্ষ একই লক্ষ্য অর্জন করেছে, যা ছিল ইহুদীদের লক্ষ্য। জার্মানীতে হপস বাগ সরকারের পতন ঘটে, গোটা জার্মানী ইহুদীদের হাতের পুতুলে পরিণত হয় এবং ইটালীতে ক্যাথলিক চার্চকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়। নেপোলিয়ান যে কাজ করতে পারেনি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তা করা সম্ভব হয়। ভ্যাটিকান সিটিকে সম্পূর্ণরূপে ইহুদীদের নিকট বন্ধক দেয়া হয়। তুরস্কে ওসমানিয়া সাম্রাজ্যের

পতন হয় এবং তুরস্ককে পরাজিতকারী ইহুদীও বিজয়ী হয়। আর তুরস্কের পক্ষ থেকে যুদ্ধকারী সবচেয়ে বড় জেনারেল মোস্তফা কামাল পাশা পরাজিত হয়েও জিতে যান। ওসমানী খেলাফতের অবসান ঘটে এবং তাকে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়া হয়।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পূর্বেও বিশ্ব দু'ভাগে বিভক্ত হয়, এক ভাগ ছিল পুঁজিবাদী ব্লক, যার নেতা ছিল বৃটেন আর অপারটা ছিল সমাজবাদী ব্লক, যার নেতা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন।

এই দু'টি ব্লকের সংঘাতে বিশ্ব সংঘাত দেখা দেয়। কিন্তু যখন যুদ্ধ শুরু হয়, তখন উভয় ব্লক ছিল একই প্লাটফর্মে এবং যুদ্ধ শিথিলকারী শক্তির (Forces of Retradation) বিরোধী ছিল। যুদ্ধে কোটি কোটি মানুষ নিহত হয়। বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স এবং রাশিয়া বিজয়ী হয়, জার্মানী, ইটালী এবং জাপান যুদ্ধে পরাজিত হয়। মূলত: যুদ্ধ শিথিলকারী শক্তি হিসাবে এ তিনটি দেশের উদ্ভব হয়। পুঁজিবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক ব্লকের মধ্যবর্তী থিসিস আর এন্টিথিসিসের মধ্যস্থলে ছিল এর অবস্থান। এরা থিসিস আর এন্টিথিসিসকে অস্থির আর ব্যাকুল করে তুলছিল। থিসিস আর এন্টিথিসিসের মাধ্যমে সিনথিসিস অর্জন করার জন্য শিথিলকারী শক্তির এসব কেন্দ্রকে ধ্বংস করা ছিল অপরিহার্য। তাই তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। তুরস্ককে আরো বিকৃত করা ছিল উদ্দেশ্য, তাই শেষ পর্যায়ে তাকেও এ দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাকে আরো বিকৃত করা ছিল তাদের লক্ষ্য। ফল দাঁড়ায় এই যে, বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং আমেরিকা যুদ্ধে বিজয়ী হয় এবং জার্মানী, ইটালী, জাপান এবং সে সঙ্গে তুরস্ক পরাজিত হয়। কিন্তু কী উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে? থিসিস এন্টিথিসিস দ্বারা কোন্ বস্তুর সিনথিসিস অর্জন করা লক্ষ্য ছিল? তা ছিল তিনটি ঃ

১. সিনথিসিসের নিয়মিত সংস্থা অর্থাৎ জাতিসংঘ, আই এম এফ তথা আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল, বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক আদালত প্রতিষ্ঠা করা।

২. ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

৩. ইহুদীবাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য জাতি সংঘ, আই এম এফ,

বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক আদলতকে ক্রীড়নকে পরিণত করে নিজেদের অভিযানকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশ্বের বুকে ইহুদী ব্লকের মাধ্যমে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা। এ দুটি ব্লক হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্লক তথা আমেরিকা এবং সমাজতান্ত্রিক ব্লক তথা রাশিয়া আর এই উভয় ব্লকের কর্মস্থল স্থির করা হয় নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council)। এ দু'টি ব্লক পরস্পরের বিরোধিতা করে যাবে, নিজেদের মধ্যে রক্তপাত ঘটাবে, কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদে এক সঙ্গে বসে সিদ্ধান্তও গ্রহণ করবে। এটা বাস্তব ঘটনা যে, ১৯৪৮ সালে আমেরিকা এবং বৃটেনের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে যখন ইসরাইল রাষ্ট্রের ঘোষণা প্রচার করা হয়, তখন অপর কোন রাষ্ট্র নয়, বরং সোভিয়েত ইউনিয়নই সর্বপ্রথম এই ঘোষণার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। এটাও একটা ইতিহাস যে, একটা রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান জাতিসংঘে এই ঘোষণার প্রতিবাদ জানালে পাকিস্তানকে কঠোরতম হুঁশিয়ারী প্রদানকারী ব্যক্তি আর কেউ ছিলনা, ছিল আঁদ্রে গ্রোমিকো, যে ছিল নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েট ইউনিয়নের স্থায়ী প্রতিনিধি।

সুতরাং এই অধমের ক্ষুদ্র মতে এই দুটি বড় দল মূলত: বিংশ শতাব্দীতে ইহুদীবাদের দু'টি অংশ; এরা বাহ্যত: একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধংদেহী এবং সংঘাতমুখর; কিন্তু তলে তলে তারা একই উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করছে এবং এদের হাতেই গোটা বিংশ শতাব্দীতে রক্তপাত ঘটেছে। দু'টি বিশ্বযুদ্ধও এর অন্তর্গত, যাতে কোটি কোটি মানুষ নিহত হয়েছে।

প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে ঃ

শেষ পর্যায়ের প্রথমাংশের অর্থ কি? ইতিপূর্বের ছত্রগুলোতে এই অংশের যে চিত্র অংকন করা হয়েছে, তা ঘটনা প্রবাহ, আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণ বা হামলার আলোকে অংকন করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী তার কি বৈশিষ্ট্য হবে?

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, প্রথমাংশ বড় জোর ২০ বৎসর পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হবে অর্থাৎ যে ১৯৯৯ এর পর যে কোন মুহূর্তে এসব ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তবে বিলম্ব হলে এ অংশের সূচনা এবং সমাপ্তি ২০ বৎসরের মধ্যে সম্ভব।

আমার ক্ষুদ্র মতে اقتتل فئتان عظيمتان তথা দুটি বড় দলের সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার যুগ ১৮৯৭ থেকে শুরু করে ১৯৮৯ থেকে ৯৭ পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়। কোন কোন বিবেচনায় তাকে ১৯৯৯ সাল বলেও ধরে নেয়া যায়। হতে পারে আরো ২ বৎসর বৃদ্ধি করে ২০০২ সালও ধরে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু আমি তা ১৯৯৯ সাল থেকে ধরেছি। ১৯৮৯ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত হিসাব করার দীর্ঘায়ন মূলত: এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে, যদি থিসিস, এন্টিথিসিস এবং সিন্থিসিসের সম্পর্কের কারণে Perestroika কে সমাপ্তি ধরে নেয়া যায় তবে ১৯৮৯ পর্যন্ত ধরে নেয়া যাবে। এবং Glasnot এর চূড়ান্ত সমাপ্তি ধরে নেয়া গেলে তাকে প্রলম্বিত করতে হবে ২০০২ সাল পর্যন্ত। আমি এর মধ্যবর্তী ১৯৯৯ কে মেনে নিয়েছি।

এখানে মহানবী (স) এর অপর একটি হাদীসের ব্যাখ্যা করা জরুরী বোধ হচ্ছে। তিনি বলেন ঃ

عن ربعي بن حراش قال : انطلقت مع أبي مسعود الأنصاري إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم فقال له أبو مسعود حدثني ماسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال ، قال : إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا ، فاما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب ، فمن أدركه منكم فليقع في الذي يراه نارا

فانه ماء عذب طيب فقال أبو مسعود : وأنا قد سمعته -
(متفق عليه)

'হযরত রাব্ঈ ইবনে হারাশ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আবূ মাস্‌উদ আনসারী হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) এর নিকট গমন করি। আবূ মাসউদ তাঁকে বললেন, দাজ্জাল সংক্রান্ত নবীজীর কাছে শ্রবণ করা কোন হাদীস বর্ণনা করুন। তিনি বললেনঃ দাজ্জাল বের হবে। তার সঙ্গে থাকবে পানি এবং আগুন। মানুষ যাকে পানি মনে করবে, তা হবে আগুন, যা জ্বালিয়ে দেবে, আর যাকে আগুন মনে করবে, তা হবে সুমিষ্ট শীতল পানি। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাকে পাবে, সে যেন তাতে পতিত হয় যাকে, সে আগুন মনে করে। কারণ, তা হবে সুমিষ্ট, শীতল এবং উত্তম পানি। আবু মাসউদ বলেন ঃ আমিও হাদীসটি শ্রবণ করেছি।' (বুখারী, মুসলিম)

স্পষ্টত হাদীসটি দাজ্জালের আবির্ভাব সংক্রান্ত। অর্থাৎ যখন দাজ্জালের আবির্ভাব হবে, তখন দাজ্জালের আগমন কালে পরিস্থিতি এমন হবে। লক্ষণ আর ভাবসাব থেকে অনুমিত হয় যে, দুটি দলের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া এবং দাজ্জালের আবির্ভাবের মধ্যখানে একটা অবকাশ কাল থাকবে। এ অবকাশ কালকে দাজ্জালের আবির্ভাবের প্রস্তুতি কাল বলা যায়। এমনিতেতো স্বয়ং দু'টি বড় দলের সংঘাতকেও তার প্রস্তুতির সময় বলা যায়। কিন্তু এর পরবর্তী সময়কে বিশেষভাবে দাজ্জালের আবির্ভাবের প্রস্তুতির সময় বলে আখ্যায়িত করা যায়।

এই দুটি হাদীসের মধ্যে একটা সাযুজ্য পাওয়া যায়, যা এর আভ্যন্তরীণ বিন্যাসকেও স্পষ্ট করে। মানব জাতির ইতিহাসের এক অস্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে, এটা প্রকাশ পাবে যে, দু'টি বড় দলের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হবে। অর্থাৎ দু'টি বড় দলের প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে পৃথিবী শতশত শ্রেণীর মধ্যে বিভক্ত হবে, অথবা কমপক্ষে দুয়ের অধিক শ্রেণীর মধ্যে বিভক্ত হবে। দুটি বড় দল প্রকাশ পাওয়ার অর্থ দাঁড়াবে যে, পৃথিবীর বিধান হিসাবে একটা Duocracy তথা দ্বৈত শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। এই Duocracy-র বৈশিষ্ট্য এই হবে যে, বাহ্যত তা হবে Duocracy এবং আভ্যন্তরীণ দিক থেকে তা হবে Monocracy একক শাসন। স্পষ্ট যে, কিছুকাল অর্থাৎ বড় যুদ্ধের

পর এই বাহ্যিক Duocracy বিদায় নেবে এবং যাহির বাতিন তথা প্রকাশ্য গোপন সকল বিবেচনায়ই একক শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রকাশ্য গোপন সকল বিবেচনায় পরিপূর্ণ Monopoly তথা একক শাসন প্রতিষ্ঠার চরম উন্নতির কাল হবে মূলত: দাজ্জালের আবিভাবের প্রথম শর্ত।

আমার ক্ষুদ্র মতে ১৮৮৭ থেকে ১৯৮৯ বা ১৯৯১ বা ১৯৯৭ থেকে ১৯৯৯ বা সর্বোচ্চ ২০০২ সাল বাহ্যিক Duocracy এবং আভ্যন্তরীন Monocracy-র যুগ এবং ১৯৯০ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ উভয় দিক থেকে Monocracy চূড়ান্ত পর্যায়ের পৌছার যুগ হবে। মূলত: এটাই হবে দাজ্জালের আবির্ভাবের সময় (এই সিদ্ধান্তে পৌছার অনেক জটিল যুক্তিপ্রমান আছে, যে সবের ব্যাখ্যা করা এখানে সম্ভব নয়।)

গোটা দুনিয়ায় যখন শয়তানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন দাজ্জালের আবির্ভাব সম্ভব। এটাকে বলা চলে চূড়ান্ত স্তরের আধিপত্য। অর্থাৎ এই শয়তানী আধিপত্যের সামনে অন্য সব আধিপত্য, সমস্ত সমাজ ব্যবস্থা এবং সমস্ত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র শেষ হয়ে যাবে। কেবল কোন সমান্তরাল ব্যবস্থা থাকা সম্ভব হবে না, এতটুকুই নয়, বরং কোন সমান্তরাল সমাজ এমন কি কোন সমান্তরাল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য টিকে থাকাও সম্ভব হবেনা। সমান্তরাল ব্যবস্থার অবসানের মাধ্যমে এই Monocracy-র সূচনা হবে। এরপর অবসান হবে সমান্তরাল সমাজের। এমন কি ব্যক্তিগত পর্যায়ে একান্ত ব্যক্তিগত আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন যাপন করাও কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হবেনা। প্রথমে সমান্তরাল বিধানকে বেআইনী বা সন্ত্রাসী (Outlow or Terrorist) বলে আখ্যায়িত করা হবে। অতঃপর সমান্তরাল দেশকে বেআইনী বা সন্ত্রাসী রাষ্ট্র Outlow or Terrorist Countries আখ্যায়িত করা হবে। এরপর সমান্তরাল সমাজ, গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিকে বেআইনী এবং সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করা হবে। সম্ভবত: এ অবস্থা প্রকাশ করার জন্যই মহানবী (স) নিম্নের কতিপয় প্রকাশভঙ্গি অবলম্বন করেন ঃ

(১) العبادة فى الهرج كهجرة الىّ .

'গোলযোগ কালে ইবাদত করা, যেন হিজরত করে আমার নিকট আগমন করা।'

(٢) من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد .
'আমার উম্মতের বিপর্যয়কালে যে আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে, সে শত শহীদের সাওয়াব পাবে।'

(٣) إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما امر به هلك ثم ياتي زمان من عمل منهم بعشر ما امر به نجا .
'তোমরা এখন এমন সময়ে আছ, যখন কোন ব্যক্তি আমার নির্দেশের এক দশমাংশ ত্যাগ করলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর এমন এক যামানা আসবে যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নির্দেশিত বিধানের এক দশমাংশ আমল করলেও সে নাজাত পাবে।'

আমার ক্ষুদ্র মতে আমরা দুই বড় দলের রক্তপাতের সমাপ্তি এবং দাজ্জালের আবির্ভাবের মধ্যবর্তী সময়ে উপনীত হয়েছি। এই সময়কেই ১৯৯৯ থেকে ২০১৯-২০২০ বা সর্বোচ্চ ২০৩০ পর্যন্ত দীর্ঘায়িত সাব্যস্ত করা হয়েছে।

হুমকি (Threates)

এই ২০ থেকে ৩০ বৎসরের সময়টাতে কি কি হুমকি রয়েছে? এসব হুমকির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমার বিভিন্ন গ্রন্থে কিছুটা আলোচনা করেছি। 'ইসলাম ও একাবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ' গ্রন্থে আমি লিখেছি ঃ

মানব জাতির মঙ্গল ও কল্যাণ সম্পর্কে আশংকা এই যে, সমকালীন বিশ্বের মানুষ যে কোন সমাজের সঙ্গেই যুক্ত থাকুক না কেন- সে যদি চলমান জাহেলী বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থায় জীবন যাপন অব্যাহত রাখে, তা হলে আগামী শতাব্দী পর্যন্ত এই পৃথিবী আত্মিক, প্রাকৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক দিক থেকে এক বা একাধিক দোর্দন্ড প্রতাপশালী স্বৈরাচারী শক্তির একশ ভাগ দাসে পরিনত হবে, মানুষের সমস্ত ব্যক্তিগত এবং সামাজিক অধিকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং খোদা বিমুখ জালিম ব্যক্তিদের একটা গোষ্ঠী তাদের উপর শাসন চালাবে চেঙ্গিজী হিংস্রতার সঙ্গে। (পৃষ্ঠা ৩৭)

'মুসলিম জাহানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি গ্রন্থে আমি ৯টি ধ্বংসাত্মক বিষয়ের

আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছি যে, এসব বিপদ আর ধ্বংস কমপক্ষে ৯ ধরনের, যা নিম্নরূপঃ

১. পাশ্চাত্য মুসলিম জাহানের সমস্ত সমুদ্রপথ অধিকার করে নেবে বা তার উপর নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে।

২. পাশ্চাত্য নিজেদের তৈরী সমস্ত এজেন্সী দ্বারা যথা ইউ এন ও এবং খুঁটির জোর ও জোরপূর্বক ইজারাদারী দ্বারা সমস্ত চলাচলের পথ অধিকার করে নেবে।

৩. খুঁটির জোর আর জোরপূর্বক ইজারাদারীর আশ্রয় নিয়ে পাশ্চাত্য এজন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে, যাতে মুসলিম জাহান আকাশ পথে তার কর্তৃত্বের অবসান ঘটাতে না পারে।

৪. পাশ্চাত্য তার নিজের তৈরী করা এজেন্সী, খুঁটির জোর এবং জোরপূর্বক ইজারাদারীর আশ্রয় নিয়ে চেষ্টা চালাচ্ছে, যাতে মুসলিম জাহানের সমুদয় খনিজ সম্পদের উপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

৫. উপরোক্ত শক্তিগুলোর আশ্রয় নিয়ে নয়া কৌশল দ্বারা সে গোটা বিশ্বের কৃষির উপর নিজের কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য সচেষ্ট।

৬. এসব কৌশল প্রয়োগ করে মুসলিম বিশ্বের গোটা মানব সম্পদকে নিজের গোলাম এবং নিজের মালিকানাধীন করার চেষ্টা চলছে।

৭. কতিপয় বিশেষ ফন্দি ফিকির দ্বারা মুসলিম বিশ্বের সমুদয় বুদ্ধিবৃত্তিক, মানসিক এবং কারিগরী যোগ্যতা আর ক্ষমতার উপর নিজের ইজারাদারী প্রতিষ্ঠা করার জন্য পাশ্চাত্য ইসলামের কণ্ঠরোধ করে মারার চেষ্টা শুরু করেছে।

৮. ১৯১৬, ১৯২৩, ১৯৪৮, ১৯৫৬, ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ এর কর্মকাণ্ড এবং ১৯৭৮ সালের ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি, ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধ এবং বর্তমানে ইসরাইল এবং পিএলও চুক্তির চক্রান্ত দ্বারা ইহুদীরা মুসলিম বিশ্বের হৃদয় অর্থাৎ শান্তির আবাসভূমি আরব উপদ্বীপকে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে নিয়েছে। গোটা আরব জাহানের মরক্কো থেকে শুরু করে পারস্য উপ-সাগর পর্যন্ত (জনগণকে বাদ দিয়ে) কার্যত: ইসরাইলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৯. এ ধারার নবম বিপদ এই যে, নানা অজুহাতে দারুল ইসলাম তথা Muslim Heartland এবং বিশেষ করে আরব জাহান এবং তার আশপাশে মুশরিক এবং মূর্তি পূজারীদের জন সংখ্যায় অস্বাভাবিক সংযোজন ঘটে চলছে।

এমনিভাবে বর্তমানে গোটা মুসলিম বিশ্ব এই নয়টি ধ্বংসাত্মক বিষয়ের সঙ্গে জীবন মৃত্যুর লড়াই করে যাচ্ছে (পৃষ্ঠা ৫-৮)।

এই গ্রন্থের ৩২ থেকে ৩৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সেই সর্বগ্রাসী একচেটিয়া আধিপত্যের পূর্ণ বিবরণ দেয়া হয়েছে যা প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে গোটা বিশ্ব, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের উপর। এসবের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

১. আকীদা-বিশ্বাস্গত একাধিপত্য- Ideological & Dogmatic Monopoly
২. অর্থনৈতিক একাধিপত্য- Economic Monopoly
৩. রাজনৈতিক একাধিপত্য- Political Monopoly
৪. সামরিক একাধিপত্য- Martial Monopoly
৫. উপায়-উপকরণের একাধিপত্য- Resource Monopoly
৬. সৈন্য সঞ্চালনগত একাধিপত্য- Logistic Monopoly
৭. কৌশলগত একাধিপত্য- Strategic Monopoly

এতদসঙ্গে আমি উক্ত গ্রন্থে এমনসব Centralisation তথা এককেন্দ্রীকরণ কৌশলগত একাধিপত্যেরও উল্লেখ করেছি, যা এই একাধিপত্যকে সর্বগ্রাসী সর্বব্যাপী (All-Pervading and All Comprehensive) করার নিমিত্ত প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। আর সেগুলো হচ্ছে এই-

১. শিক্ষার এককেন্দ্রী করণ- Academic Centralisation
২. তথ্য ও জ্ঞান এককেন্দ্রী করণ- Informational & Knowledge Centralisation
৩. উপাত্ত এককেন্দ্রীকরণ Data Centralisation
৪. যোগাযোগ ক্ষেত্রে এককেন্দ্রীকরণ Communcational

Centralisation

৫. সাংস্কৃতিক এককেন্দ্রীকরণ Cultural Centralisation

৬. ভাষাগত এককেন্দ্রীকরণ Lingual Centralisation

৭. সময়গত এককেন্দ্রীকরণ Timons Centralisation

৮. নৈতিক এককেন্দ্রীকরণ Moral Centralisation

মুসলিম বিশ্বের রূহানী পরিস্থিতি গ্রন্থে লিখেছিঃ

"বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ এক নাজুক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। উম্মাহ্র অধিকাংশ লোকই জানে না যে, তাদের কেবল রাজনৈতিক ব্যবস্থাই লণ্ডভণ্ড হয়নি, তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও ভেঙ্গে পড়েছে, তাকে উত্তম উপকরণ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। কেবল এ পর্যন্তই শেষ নয়, বরং ইহুদী প্রভাব, হস্তক্ষেপ আর আক্রমণে আজ তাদের রূহানী ব্যবস্থাও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। উম্মতের জীবনে আজ এর স্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। মুসলিম মিল্লাতের জন্য সবচেয়ে বড় দুঃখজনক ঘটনা এই যে, তার সকল ব্যবস্থার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবকিছুর মূল এই রূহানী ব্যবস্থাকে তছনছ করা হচ্ছে, অথচ তার খবরও নেই। বরং তাকে লণ্ডভণ্ড করার কাজে সে নিজেই আল্লাহ্র দুশমনদের ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বর্তমানে উম্মতের মধ্যে একের পর এক যে সব মর্মবিদারী ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে, সেসব কেবল এ কারণে নয় যে, খিলাফাতের অবসান ঘটেছে, কিংবা উম্মত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছে, বরং এর মূল কারণ এই যে, আজ তার রূহানী ব্যবস্থা ভেঙ্গে খানখান হয়ে পড়েছে। ফেরেশতাকুল, দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমান, ঊর্ধ জগত, আরশ পরিবেষ্টনকারী ফেরেশতা কুল, আরশে মুআল্লা, বরং স্বয়ং মহান আল্লাহ্র সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন না হলেও দুর্বল হয়ে পড়েছে। এখন আর তার দোয়া কবুল হয় না। বিশ্বাস এখন আর তার বশীভূত নয়। অন্যান্য সৃষ্ট জীবরা এখন আর মুসলিম মিল্লাতের জন্য দোয়া করেনা। তাদের অন্তর, তাদের দেহ, তাদের গৃহ, তাদের মহল্লা, তাদের এলাকা এবং তাদের দেশ এখন শয়তানের নর্তন-কুর্দন শালায় পরিণত হয়েছে। মহাবিশ্বে মহান আল্লাহ যে খোদায়ী বিধান প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা থেকে সে

নিজেকে মুক্ত ও পৃথক করে নিয়েছে। খোদায়ী বিধানের অধীনে বসবাসকারীদের জন্য শান্তি-স্বস্তি ছিল, সেখানে নাযিল হতো অনাবিল প্রশান্তি।" (পৃষ্ঠা ১৫-১৬)

সে গ্রন্থে নিবেদন করা হয়েছিল ঃ

ইহুদীদের সঙ্গে উম্মতে মুসলিমার সংঘাত-সংঘর্ষের মূলে রয়েছে এমন দু'টি পরস্পর বিরোধী লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সংঘাত, যা স্ব-স্ব স্থানে এই দুই জাতির অস্তিত্বেরই লক্ষ্য উদ্দেশ্য। উম্মতে মুসলিমা হচেছ হিজবুল্লাহ তথা আল্লাহ্র দল। তার পদ-মর্যাদার দায়িত্ব-কর্তব্যই হচ্ছে আল্লাহ্র মিশনকে জয়যুক্ত করা, মানুষকে আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সুখী-সমৃদ্ধ করা এবং মানবেতিহাসকে সর্বোত্তম পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া। পক্ষান্তরে ইহুদীরা হচ্ছে হিজবুশ শয়তান- শয়তানের দল। তাদের মিশন হচ্ছে শয়তানের মিশনকে সফল করা, আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষকে খাট করা এবং মানব ইতিহাসকে মন্দ পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া। এই হচ্ছে হিজবুল্লাহ্র সঙ্গে শয়তানের দ্বন্দ্ব সংঘাত। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির সঙ্গে শয়তানের মনস্কামনার দ্বন্দ্ব সংঘাত। এ হচ্ছে ইবলিসী মিশনের সঙ্গে খোদায়ী মিশনের সংঘাত। বর্তমান যুগে বিশেষ করে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ইহুদীদের সঙ্গে মুসলিম মিল্লাতের সংঘাত কেবল পার্থিব সংঘাতই নয়, বরং এ হচ্ছে সত্য আর মিথ্যার সংঘাত। সব কিছুই এ ধারার অব্যাহত যাত্রা। (মুসলিম বিশ্বের রূহানী পরিস্থিতি, পৃষ্ঠা ৪৮-৪৯)।

আমি মহানবী (স) এর হাদীসের উল্লেখ করেছি। যা বর্ণনা করেছেন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ। এতে মহানবী (স) প্রাচীরে ফাটল ধরা এবং ইয়াজুজ মাজুজ প্রকাশ পাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। মুসলিম বিশ্বের রূহানী পরিস্থিতির এ বক্তব্য নিয়ে চিন্তা করা উচিত, যেখানে বলেছিলাম:

"মুসলিম মিল্লাতের প্রতি ইহুদীরা যে সব হামলা পরিচালনা করে তন্মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক, সবচেয়ে কার্যকর এবং সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক হচ্ছে সে হামলা যা তারা শয়তানী শক্তির সাহায্যে পরিচালনা করে মুসলমানদের রূহানী ব্যবস্থা লণ্ডভণ্ড করার জন্য। এটাই হচ্ছে প্রকৃত সত্য এবং আসল তত্ত্বকথা।"

এসব হামলা সত্ত্বেও আল্লাহ্র মেহেরবানীতে মুসলিম উম্মত এখনো জীবন্ত আছে বটে, তবে এসব হামলায় তারা জর্জরিত এবং পর্যুদস্ত। আজ তাদের দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম। এক এক করে তাদের সমুদয় বাহ্য ব্যবস্থা আজ ছিন্নভিন্ন। অথবা ছিন্ন হওয়ার পথে। মূলত এর কারণ হচ্ছে আজ তাদের রূহনী ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতাদের দ্বারা হিফাযত না করলে উম্মতে মুসলিমা কবেই ধ্বংস হয়ে যেতো। (মুসলিম বিশ্বের রূহানী পরিস্থিতি পৃষ্ঠা- ৫১)।

এসব বড় বড় ঘটনাবলীর মধ্যে নিচের ঘটনাগুলো বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য:

(১) খিলাফতে রাশেদার অবসান
(২) উমাইয়া খিলাফতের অবসান
(৩) আব্বাসিয়া খিলাফাতের অবসান
(৪) বায়তুল মুকাদ্দাসের পতন
(৫) স্পেনের পতন
(৬) মুগল বংশের পতন
(৭) সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন
(৮) ওসমানী খিলাফাতের অবসান
(৯) ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা -১৯৪৮
(১০) বায়তুল মুকাদ্দাসের পতন -১৯৬৭
(১১) উপসাগরীয় যুদ্ধ -১৯৯১
(১২) বাবরী মসজিদ ধ্বংস -১৯৯২।

মুসলিম বিশ্বের নৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে এ সম্পর্কে পর্যালোচনা প্রসঙ্গে আমি লিখেছি ঃ

"উসাগরীয় যুদ্ধের পর নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার সূচনা হয়েছে। গোটা বিশ্বে বর্তমানে সেকুলারাইজেশান তথা ধর্মনিরপেক্ষায়নের কাজ এখন মৌলিকভাবে আন্তর্জাতিক কার্যকারণের মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়া শুরু হয়েছে। ইহুদীরা বর্তমানে শয়তানের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করছে। আর তাদের মিশন হচ্ছে খোদায়ী ব্যবস্থা ধ্বংস করে তদস্থলে শয়তানী ব্যবস্থা জারী করা

... এই সর্বগ্রাসী ব্যবস্থার অপর নাম হয় যায় সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা। ... উপসাগরীয় যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরবর্তী পদক্ষেপ ঘোষণা করা হয়েছে, যাকে বলা চলে নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা, (New world order) এই নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার অধীনে জাতিসংঘের পতাকাতলে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্টের অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার অধীনে এই নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা সুশীল উন্নয়নের কাজ শুরু করার ঘোষণা দিয়েছে, বিশ্ব যাকে জানে পরিবেশ ও উন্নয়নের ঘোষণা হিসাবে।

ইহুদীদের পরিকল্পিত সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা সম্পর্কে মুসলিম মিল্লাতের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য জানুক বা না জানুক, ইহুদীরা কিন্তু ঠিকই জানে যে, আজ হোক বা কাল, এ সম্পর্কে তারা অবশ্যই জানবে এবং জানলে তারা এটাকে পুরোপুরি মেনে নেয়াতো দুরের কথা, এর কোন অংশের সঙ্গেও আপোষ করতে প্রস্তুত হবেনা এবং শেষ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধাচরণ প্রকাশ্য সংঘাতের রূপ ধারণ করবে। তাই তারা দ্বি-মেরু ব্যবস্থার মাধ্যমে (Bipolar System) সকল রক্ষাব্যূহকে যেভাবে আছে থাকতে দিয়েছে (এখানে NATO বুঝানো হয়েছে) .... তাইতো আমেরিকা, যার উপর শয়তানী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার মূল দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল, এখন সে একটা কিছু করতে বা কিছু দূর অগ্রসর হতে বাধ্য (সার সংক্ষেপ: মুসলিম বিশ্বের নৌতিক পরিস্থিতি পৃষ্ঠা ৩৪৩-৩৪৫)।

সামনে অগ্রসর হয়ে এ গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর ইহুদীবাদ সেই ভয়ংকর পথে অগ্রসর হচ্ছে, যেখানে পৌছে সে এখন চাপ সৃষ্টি আর বল প্রয়োগের আশ্রয় নিয়ে কোন অঞ্চল বা কোন দেশে নয়, বরং গোটা মুসলিম উম্মতকে একই সঙ্গে এবং একই সময়ে কেন্দ্র থেকেই ধর্মনিরপেক্ষ করতে চায়। .... অব্যশ্য সমস্ত চেষ্টা-সাধনা সত্ত্বেও ইহুদীবাদ ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে ধর্মনিরপেক্ষ করতে ব্যর্থ হয়েছে। বরং এখন সে উত্তেজিত হয়ে আবোল-তাবোল বকাবকি শুরু করছে। তার শক্তি খর্ব হচ্ছে এবং সে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। আশংকা করা হচ্ছে যে, ব্যাধির প্রকোপে সম্বিত হারা মানুষের মতো এই জাতি এখন ভয়ংকর থেকে ভয়ংকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। (মুসলিম বিশ্বের নৈতিক পরিস্থিতি, পৃষ্ঠা- ৩৬৮)।

নয়া ন্যাটো চুক্তি

২২ এপ্রিল ১৯৯৯ সালে ন্যাটোর পঞ্চাশতম বার্ষিকী উপলক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবসান শেষে ন্যাটো তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ঘোষণা করেছে, যার মোদ্দা কথা হচ্ছে গোটা বিশ্ব থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করা। এ হচ্ছে সে আংশকা, দাজ্জালের আভির্ভাব পূর্বকালের ঘটনাবলী প্রসঙ্গে যার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে শয়তানী সাম্রাজ্যের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর গোটা বিশ্বের বুক থেকে সমান্তরাল ব্যবস্থা, সমান্তরাল দেশ, সমান্তরাল সমাজ, সমান্তরাল গোষ্ঠি, এমনকি সমান্তরাল ব্যক্তি (Out-Law or terrorist Orders, Countries, Societies, Gronps Individuals) পর্যন্ত নির্মূল করার চেষ্টা চালাবে, যাতে গোটা বিশ্বের বুকে এক সর্বাত্মক একচেটিয়া আধিপত্য All Pervading & Comprehensive Monocracy স্থাপিত হতে পারে।

হুমকি সম্পর্কে অসতর্কতা

এসব হুমকি সম্পর্কে মুসলিম মিল্লাতের সাধারণ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কতটা অবগত আছে তা বলা যায়না। একথাও বলা যায়না যে, এসব হুমকি সম্পর্কে তারা অবগত হয়ে থাকলে তাদের সে অবগতি কোন্ স্তরের কোন্ পর্যায়ের। একথাও বলা যায়না যে, এসব হুমকি সম্পর্কে বাস্তবিকই সে চিন্তন্বতও কিনা, না কি নিছক সময় কাটাবার জন্যই সে এসব বিষয়ের উল্লেখ করছে মাত্র।

বিগত ২০ বছর থেকে নানা উপলক্ষে এই সত্য বারবার উচ্চারিত হয়ে আসছে যে, মুসলিম উম্মতের সাধারণ জনতা ও নেতৃবর্গ এসব হুঁশিয়ারী সম্পর্কে প্রাথমিক ভাবেও অবগত নয়। তাদের এই অজ্ঞতা-ই পূর্বাহ্নে বা কমপক্ষে যথাসময়ে এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে না পারার কারণ ছিল।

এখন যেহেতু পরিস্থিতি এমনই জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, তা ভাষায় ব্যক্ত করাও কঠিন এবং বাহ্যত পরিস্থিতি আয়ত্বের বাইরে চলে গেছে। এ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, উম্মতের সাধারণ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এসব

হুঁশিয়ারী সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাও রাখেনা। সাম্প্রতিক কালে বিগত ৬ই এপ্রিল পাকিস্তানের ঘোরী-১ পরীক্ষা করায় এসত্য উদঘাটিত হয়েছে। ২৮ এপ্রিল ১৯৯৮ সালে পারমাণবিক বিস্ফোরণ এবং ১৯৯৯ সালে এপ্রিল মাসে ঘোরী-১ এবং শাহীন- ১ এরও পরীক্ষা চালায় পাকিস্তান।

সাধারণ মানুষের কথা তো বাদ, বিশেষ ব্যক্তিবর্গও এতদসংক্রান্ত বিষয়ে যা কিছু বলাবলি করেন, তাতে একথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, প্রকৃত হুমকি Threat Perception সম্পর্কে আদৌ অবহিত নয়।

হিন্দুস্তান এবং পাকিস্তান এই দু'টি দেশের কারোই একে অপরের বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই এসব ক্ষেপণাস্ত্রেরও। আর একথা উভয় দেশ জানে, জানে উভয় দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও। উভয় দেশের জন্য যখন এ দুটো পরীক্ষা প্রকৃত হুমকির আওতা বহির্ভূত, তখন এসব পরীক্ষা সম্পর্কে এমন কথা বলা যে, আমরা এটা এজন্য করেছি যে, কমপক্ষে ন্যূনতম বিশ্বাসযোগ্য প্রতিরোধ গড়ে তোলা (Minimum Credible Deterrent) আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল- এমন কথা বলা কেবল অর্থহীনই নয়, বরং প্রতারণামূলকও। এ থেকে যে কথাটা সম্মুখে আসে, তা এই যে, মুসলিম উম্মার সাধারণ মানুষতো দূরের কথা, তাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও উম্মতের প্রকৃত হুমকি বিষয়ে অবগত নয়। কেননা মুসলিম মিল্লাতের জন্য ন্যূনতম বিশ্বাসযোগ্য প্রতিরোধক (Minimum Credible Deterrent)- হিসাবে এহেন পরীক্ষা-নিরীক্ষা আদৌ যথেষ্ট হতে পারেনা।

এখানে সংক্ষেপে একথা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন যে, মুসলিম উম্মার জন্য এই ২০ বৎসরের একেবারেই সূচনা অর্থাৎ ১৯৯৯ সালের মে মাসে হুমকির পরিমাণ (Magnitude of threats) কতখানি।

অতীব দুঃখের বিষয় যে, মুসলিম উম্মার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ বিষয়ে সর্বদা অবহেলা, অলসতা এবং অজ্ঞতার প্রমাণ পেশ করেছেন। উম্মত বাস্তবিক যে হুমকির সম্মুখীন সে (Actual Dangers) সম্পর্কে অবগতি তো ভিন্ন কথা, এমন সব ঘোষণা, যা আগে সীমিত ছিল পরে ব্যাপক করা হয়েছে সে

বিষয়েও কখনো তাদের মধ্যে এ অনুভূতি জাগ্রত হয়নি যে, মুসলিম উম্মাহকে বাস্তবিক পক্ষে কোন্ সব হুমকির মোকাবিলা করতে হবে। এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে হবে এবং এ সম্পর্কে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। এখানে কেবল দু'টি দলীল পত্র (Documents) উল্লেখ করা আমি যথেষ্ট মনে করি, যা ১৯৫২ এবং ১৯৬৭ সালে সম্পূর্ণ সাধারণ ভাবে প্রকাশ করা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি তা পাঠ করে দেখতে পারে। কিন্তু আমার জানামতে গোটা মুসলিম জাহানে কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি এ সম্পর্কে কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্তি করেননি। এ গুলোর মধ্যে প্রথম গ্রন্থটি হচ্ছেঃ

The year 2000: A Frame - work for Speculation on the Next Thirty Years : by Herman kahn and Anthony J. Wiener: The Macmillan Company, New York 1967.

আর দ্বিতীয় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে তারও ১৫ বৎসর পূর্বে ১৯৫২ সালে যার নাম এই- The Taming of the Nations: A Study of the Cultural Bases of International Policy: by F.S. Northrop: New York, 1952, The Macmillan Company.

যদি উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ- আলেম সমাজ, জ্ঞানী-গুণী পরামর্শদাতা, বুদ্ধিজীবী এবং দণ্ডমুন্ডের কর্তা ব্যক্তিরা উম্মত সম্পর্কে সামান্য অনুভূতি সম্পন্ন এবং সচেতন থাকতেন তবে তারা এ ধরনের অসংখ্য গ্রন্থ এবং ডকুমেন্ট অবশ্যই অধ্যয়ন করতেন এবং সে সম্পর্কে অবহিত হয়ে কেবল অবিলম্বে উম্মতকে কার্যকর পদ্ধতিতে সেসব হুমকি সম্পর্কে কেবল অবহিতই করতেন না, বরং তার প্রতিরোধ করার জন্য কার্যকর এবং লক্ষণীয় প্রচেষ্টাও চালাতেন। কিন্তু গোটা মুসলিম বিশ্বের বিগত ৫০ বৎসর পর্যালোচনা করলে যে তথ্য সম্মুখে আসে তা এই যে, তাদের মধ্যে এমন কোন সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়নি। বরং সত্যকথা এই যে, এ বিষয়ে উম্মতের মধ্যে কোন অনুভূতিও লক্ষ্য করা যায়নি। উম্মতের মধ্যে অনুভূতি ছিল, অনুভূতি ছিল উম্মতের সাধারণ মানুষের মধ্যেও। উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাদের সে অনুভূতিকে ব্যবহার করেছেন কেবল নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। তারা আলেম শ্রেণী, বুদ্ধিজীবি বা দণ্ডমুণ্ডের মালিক, যেই

হোকনা কেন। উম্মতের অনুভূতির নামে যে বস্তুটা জারী রাখা হয়েছে, তা ছিল কেবল ধ্বনি তোলা, যার পেছনে লুকিয়ে ছিল অমার্জনীয় অজ্ঞতা, অনুভূতিহীনতা এবং স্বার্থপরতা।

কোন বড় ভয়ংকর ঘটনা দুর্ঘটনার পর সে সম্পর্কে পর্যালোচনা, গবেষণা চালিয়ে ঘটনার গভীরে পৌঁছার চেষ্টা কেউ করেননি। একাজটা যে করা কর্তব্য, তা কোন জ্ঞানী-বুদ্ধিজীবী, কোন মুসলিম সরকার, কোন শিল্প বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানও অনুধাবন করেনি। সে ঘটনা বা দুর্ঘটনা কেন ঘটলো, তার গভীরে পৌঁছে অনুসন্ধান চালানোর কাজটি কোন মহলই করেনি। গোটা উম্মত যাতে এ সম্পর্কে ভবিষ্যতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে, সে লক্ষ্যে ঘটনার ফলাফল সম্পর্কে কেউ তাদেরকে অবহিতও করেনি। ওসমানি খিলাফতের অবসান ঘটলো। এ বিষয়ে কি একটা গবেষণা কর্মও পরিচালিত হয়েছে? এমন কোন একটা ডকুমেন্টও কি মুসলিম মিল্লাতের নিকট আছে, যা দ্বারা সাধারণ মানুষতো দূরে থাক, একান্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও এর তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত হতে পারেন? ১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম হলো। এ ব্যাপারে কোন একটা গবেষণা কর্মও কি উম্মতের সম্মুখে আছে? ১৯৬৭ স্যালে বায়তুল মুকাদ্দাসের পতন হলো। এ বিষয়ে কোন একটা ব্যাপক গবেষণাও কি উম্মতের সম্মুখে এসেছে? ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে যেসব ঘটনা ঘটলো, এ বিষয়েও কি কোন ব্যাপক ভিত্তিক গবেষণা চালানো হয়েছে? ১৯৭৫ সালে বাদশাহ ফয়সলের শাহাদাতের ঘটনা ঘটে। এ বিষয়ে কি কোন গবেষণা হয়েছে? উপসাগরীয় যুদ্ধ হলো ১৯৯১ সালে। এ বিষয়ে একটা মূল্যবান ডকুমেন্টও কি উম্মতের সম্মুখে এসেছে? সত্য কথা এই যে, পাশ্চাত্যের Classified বা Declassified দলীল যাদের হস্তগত হয়নি, তারা দশ বৎসর পর আজ একথাও জানবেনা যে, উপ-সাগরীয় যুদ্ধ কেমন যুদ্ধ ছিল? এই যুদ্ধে কি কি ঘটেছিল? এ যুদ্ধে কে পরাজিত হয়েছিল আর কে জয়ী হয়েছিল? এ যুদ্ধে কী ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে? সে যুদ্ধ শেষ হয়েছে, না হয়নি? উপসাগরীয় যুদ্ধের লক্ষ্য কি ছিল? কোন্‌পক্ষ কোন্‌ লক্ষ অর্জন করেছে? উম্মতের সাধারণ মানুষতো দূরের কথা, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও এখন পর্যন্ত এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অথচ প্রচুর

সময় অতিবাহিত হয়েছে এ যুদ্ধের অবসানের পর। আর সেই দুর্দমনীয় শক্তি উপসাগরে দীর্ঘ লম্ফের (Vertical Jump) পর অপর একটা দীর্ঘ লম্ফ দিয়ে যুগোশ্লাভিয়ায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছে (অর্থাৎ ন্যাটো এবং সার্বিয়ার যুদ্ধ, যা মার্চ ১৯৯৯ সালে শুরু হয়েছে।

বাস্তবতা সম্পর্কে উম্মতের অজ্ঞতা এমনই প্রকট এবং তীব্র হয়ে পড়েছে যে, তারা একটা বিশেষ আবহ গড়ে নিয়েছে, যা বর্তমানে মুসলিম সমাজের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বুদ্ধিজীবী এবং দন্ডমূন্ডের মালিকরাও এতে জড়িয়ে গেছেন। এই Ethos এক ধরনের মৌলিক অজ্ঞতা আর এই অজ্ঞতা-ই ছেয়ে আছে চারদিকে। এই অজ্ঞতা বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গকে এক ধরনের প্রশান্তিতে নিমজ্জিত করে রেখেছে। কোন বৃহৎ ঘটনা ঘটলেও তারা এমনভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন, যেন পরিস্থিতি সম্পর্কে তারা ভালোভাবে অবহিত আছেন। অথচ বাস্তবতা এই যে, তারা আদৌ কোন খবরই রাখেন না।

এ কারণে আমি যখন ইহুদীদের দীর্ঘ ভারসাম্য ভাঙ্গার জন্য উম্মতের সম্মুখে তিনটি প্রস্তাব পেশ করি। অর্থাৎ ঃ

(১) সর্বাত্মক সামরিক শক্তি তথা Deterrent অর্জন।

(২) ব্যালাষ্টিক ডেলিভারী সিস্টেম অর্জন ও প্রতিষ্ঠা।

(৩) মহাকাশে পরিবহন ব্যবস্থা স্থাপন করা।

তখন বিশেষ বিশেষ মহল থেকে এর এমন অর্থ করা হয়, যা কোন জাতিগত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অধীনে ন্যনতম প্রতিরোধ ব্যবস্থার অর্থ হতে পারে। স্পষ্টত এমন অবস্থাকে ঘটনা আর পরিবেশ, পরিস্থিতি সম্পর্কে কেবল স্পষ্ট অজ্ঞতা-ই নয়, বরং সর্বাত্মক অজ্ঞতা নাম দেয়া যায়। তাই আমার আশংকা হচ্ছে; বিগত ১ বৎসরের পরীক্ষা-নরীক্ষা সম্পর্কে যে সব অনুভূতি ব্যক্ত করা হচ্ছে। তা এই সর্বাত্মক অজ্ঞতার একটা অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব পরীক্ষা নিরীক্ষাকে যদি ন্যনতম প্রতিরোধক বলে অভিহিত করা হয় তবে এর চেয়ে বড় অজ্ঞতা-অনভিজ্ঞতা আর কিছুই হতে পারেনা।

মুসলিম উম্মার সম্মুখে যে সব হুমকি আর চ্যালেঞ্জ রয়েছে এবং যে সব সম্পর্কে শংকা ব্যক্ত করা হয়েছে এবং যে ১৯৯৯ সালের পর মুসলিম মিল্লাতের সম্মুখে যে সব আশংকা দেখা দিতে পারে, সে সবের সম্মুখে এহেন Minimum Credible Deterren ন্যনতম বিশ্বাসযোগ্য প্রতিরোধক খড়-কুটোর মতো উড়ে যাবে। এ পরিমাণ অর্জনকে Minimum Credible Deterrent বলা অন্য কোন দেশের জন্য মানানসই হতে পারে, কিন্তু উম্মতে মুসলিমার জন্য এমন ধারণা করা হবে স্পষ্ট ভুল। আর এর চেয়েও বড় ভুল হবে কোন মুসলিম দেশের এই Unipolar world একক বলয়ভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থায় নিজেকে Nation state এর উপর অনুমান করা। এ কারণে আমার আশংকা হচ্ছে এ সব সাফল্যের উপর এটা অনুভব করা যে, আমরা তো Minimum Credible Deterren অর্জন করেছি আর এতে আশ্বস্ত হওয়া এমন এক অজ্ঞতাসুলভ আশ্বস্তির জন্ম দেয়, যা আত্মহত্যার সমার্থক। মুসলিম উম্মতের দণ্ডমুণ্ডের মালিকদেরকে এহেন আত্মহত্যার দিকে অগ্রসর হতে দেখে আমি শংকিত। সঙ্গে সঙ্গে তারা গোটা জাতিকে এহেন ধ্বংসাত্মক স্বস্তির দিকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখে আমি আরো বেশী শংকিত। অথচ এই দুটি অবস্থায়ই তাদের নিকট সময় মোটেই বেশী নেই।

উপসাগরীয় যুদ্ধ ছিল বিশ্বের বুকে প্রথম পারমাণবিক, জৈবিক, রাসায়নিক, ইলেকট্রোনিক এবং আকাশ যুদ্ধ। এখন বিশ্বের বুকে এর চেয়ে নিম্নমানের কোন যুদ্ধ হতে পারেনা। এখন কেবল এবং কেবল এটাই হতে পারে যে, বিশ্বের বুকে এমন একটা যুদ্ধ সংঘটিত হবে, যা হবে বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক, জৈবিক, রাসায়নিক, ইলেকট্রোনিক এবং আকাশ যুদ্ধ। এমন যুদ্ধ কয়েক বৎসর নয়, বড় জোর কয়েক মাস দূরে। এমন একটা যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া না হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা ৮০ এবং ২০ ভাগ।

এ পর্যায়ে ভেবে দেখতে হবে যে, এখন যুদ্ধের পরিণতি কি হবে, কেমন হবে? এ জিজ্ঞাসাটাকে দু'ভাবে বিভক্ত করা যায়। অর্থাৎ এ কথাতো এখন প্রায় স্থির হয়ে গেছে যে, যে কোন যুদ্ধ সূচনা করার ঠিকাদারীতো এখন কেবল সে শয়তানী শক্তিই অর্জন করেছে এককভাবে। সুতরাং এখন যে কোন যুদ্ধের সূচনা হবে তার এগিয়ে আসার দ্বারা। তাই যখন সেই শয়তানী শক্তি কারো উপর হামলা চালাবে যার ফলে যথারীতি যুদ্ধও শুরু হয়ে যাবে, তখন যে শক্তির উপর হামলা চালানো হবে, সে কি ভাবে যুদ্ধ করবে? এটা দু'রকম হতে পারে: (১) আক্রমনাত্মক প্রতিরোধ এবং (২) আত্মরক্ষা মূলক প্রতিরোধ। বর্তমান পরিস্থিতিতে এর পরিণতি কি হতে পারে, তাতো জানা কথা। আর তা এই যে, প্রতিরোধকারী শেষ পর্যন্ত বিধ্বস্ত আর নিঃশেষ হয়ে তার যেটুকু শক্তি আর কর্মক্ষমতা (Potential) ছিল, তা-ও হারিয়ে বসবে। ইরাক এবং সার্বিয়ায় আমরা এটা প্রত্যক্ষ করেছি। তবে স্বয়ং হামলাকারী যদি নানা কারণে তা বন্ধ করে সেটা ভিন্ন কথা। যেমন সোমালিয়ায়। এটাতো নিশ্চিত যে, যতক্ষণ হামলাকারীর মুকাবিলা প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ পর্যন্ত ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ থাকবে, ততক্ষণ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে পারেনা। আক্রমনাত্মক মুকাবিলার সাহস কেবল সে শক্তিই করতে পারে, যে শক্তি তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ বাধিয়ে জিতার ক্ষমতা রাখে। তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধে যে পক্ষ পরাজিত হবে, তার সবকিছুই হবে নিশ্চিহ্ন (ধরা পৃষ্ঠ থেকে সে এমন ভাবে মুছে যাবে, যেন কোনদিন সে ছিলই না)। যাই হোক, সে শয়তানী শক্তির সম্মুখে গোটা মানবতা এবং বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহ্ একদিকে দৈত্য, অন্যদিকে গভীর সমুদ্র- এরূপ অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে।

যুদ্ধের পরিণতি (এবং বিশেষ করে ইরাক ও সার্বিয়া পরবর্তী যুগ, অর্থাৎ যাতে জাতিসংঘের অস্তিত্ব কোন রকম ঘোষণা ব্যতিরেকেই শেষ হয়ে গেছে) কি? তাকে দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে, প্রথম দৃষ্টিকোণ থেকে এটা দেখতে হবে যে, এযাবত যেসব যুদ্ধ করা হয়েছে, তার শেষ যুদ্ধটি বা একাধিক যুদ্ধ কোন্ মানদণ্ডে পৌছেছে। অপর দৃষ্টিকোণ্ থেকে

এটা দেখতে হবে যে, ভবিষ্যতে কার্যকর ভাবে যুদ্ধ কোথায় শুরু হতে পারে? বিশেষ করে সামনে অগ্রসর হয়ে প্রতিরোধমূলক হামলার ক্ষেত্রে।

এ সম্পর্কে সর্বাত্মক পর্যালোচনা করার এখানে আদৌ অবকাশ নেই। নিচের ছত্রগুলোতে আমি যুদ্ধের কেবল একটা দিক অর্থাৎ ইলেক্ট্রনিক যুদ্ধের স্থাপনা (Establishments or Facilities) এর উল্লেখ করবো, যা উপ-সাগরীয় যুদ্ধে সিদ্ধান্তকর প্রমাণিত হয়েছে। এর একটা সংক্ষিপ্ত কিন্তু লক্ষণীয় পর্যালোচনা করেছে এক হিন্দুস্তানী স্ট্রাটেজিক সংস্থা, যার শিরোনাম হলো : Electronic Dedicated Platforms in the Gulf War. এই সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে Institute for Defence Studies and Analysis Vol. XV No. 12, Vol XV No. 11, Vol. XVI No. 3 সংখ্যায়, এখানে সে সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো।

(1) Electronic Dedicated Platforms in the Gulf War ... Part 1 .... Electronic Warfare (E W) Systems ... by Yashwant Deva Vol XV No. II February 1993.

(2) Electronic Dedicated Platfroms in the Gulf war ... Part II ... Early warning, Surveillance, Target Attack and Control System by Yashwant Deva, Vol. XV No. 12 March 1993.

(3) Electronic Dedicated Platforms in the Gulfwar .... III .... Intelligence Gathering Systems ... by Yashwant Deva Vol XVI No. 3 June 1993.

প্রথম নিবন্ধে সমীক্ষা লেখক Electronic warfare (EW) এর নানা উপকরণ Prowler, Raven, SEAD (Suppression of enemy air defence) C CM এবং Wild Weasel সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার পর অবশেষে এই ফল বের করেন : "Electronic Capture of an early warning radar by EF-IllA was of greater significance to the outcome of the war than Physical Capture of Hell's Highway. This is what

makes the Gulf war different and unique from the earlier ones."

উপ-সাগরীয় যুদ্ধে যে E.W. Platform স্থাপন করা হয়, তা ছিল এ রকম:

(1) F-4c/Wild weasel

(2) EA-IIIA/Raven

(3) EA-6B/ Prowler

(4) EC- 130H/ Compass call

(5) EH- 60A/Helicopters

অপর নিবন্ধে সমীক্ষা লেখক Early warning, Surveillance, Target Attack & Control, System. Warning, J-Stars, Early Warning Satellite-এর বিস্তারিত আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করেন ঃ

Foreword to Jane's Battlefeild Surveillence Systems 1990-91 is an apt Summing up to this part of our discussion on electronic platform in the Gulf war viz. "It is clear that even in an area of peace. all nations an especially small ones, will need to maintain the widest range of Surveillance System, if they are to retain their independencc." There is no gain saying the need to match a defence acquisition policy to a realistic threat driven national security agenda. And to this end, the option is limited to providing a platform based early warning and control capability to the defence service, its high cost nonwithstanding.

তাইতো উপসাগরীয় যুদ্ধে Early Warning (EW) সম্পর্কে যে প্লাটফর্ম স্থাপন করা হয়, তা ছিল নিম্নরূপঃ

(1) E-2C/ Hawkeye

(2) E-3A/3C/Sentry

(3) E-18c/E8A/J-Stars

(4) DSP

তৃতীয় নিবন্ধে সমীক্ষা লেখক Intelligence Gathering System (EGS) এর তিনটি বাস্তব গ্রুপ Human Intelligence (HUMINT), Signal Intelligenee (SIGNIT) এবং Image Intelligence (IMINT) এর উপকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার পর এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেনঃ

"Platform borne intelligence systems can create asymmetries in the Third World Countries, the effect of which can be highly destabilizing. Today, the west, particularly the US. has a monopoly of advanced electronic systems that can be exploited to decide as to which country can have access to information. This tantamounts to creation of not technology denial regimes, but also, a network of selectively applied, informations filters. That it would have serious implications on the security of the target countries is but obvious."

উপসাগরীয় যুদ্ধে এতদসংক্রান্ত যে সমস্ত প্লাটফর্ম স্থাপন করা হয়, তা ছিল নিম্নরূপঃ

(1) TR-IA

(2) RF-4C --- 4E

(3) RF-5E Tigereye

(4) RC- 135V/W/Rivet Joint

(5) RC-135S/Cobra Ball

(6) OV-ID/RV-ID

(7) OV-10D

(8) Mirage F1-CR

(9) Tornado GR-1

(10) Pioneer

(11) Pointer

(12) BQM 147 A/Exdrome

(13) MART

(14) AN/USD-501/(CL-89)

(15) KH-11

(16) Lacrosse

মহাকাশ থেকে আশংকা

দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যে বিষয়টা ভেবে দেখা দরকার তা হলো, আগামীতে যুদ্ধ কার্যকর ভাবে কোথা থেকে শুরু হতে পারে, বিশেষ করে এমন এক পরিস্থিতিতে, যখন এই হামলার জবাব দেয়া হবে আক্রমনাত্মক মুকাবিলা দ্বারা।

এই দৃষ্টিকোণ থেকেও এ সংক্ষিপ্ত পুস্তকে পারমাণবিক অস্ত্র (Nuclear Weapons). কৌশালগত অস্ত্র (Strategic Weapon) রাসায়নিক অস্ত্র (Chemical Weapons) এবং জীবানু অস্ত্র (Bacterotogical Weapons) সম্পর্কে আলোচনা করার অবকাশ নেই। সুতরাং এখানে এ প্রসঙ্গে কেবল সে অস্ত্রের সম্প্রসারণ সম্পর্কে আলোচনা করাই যথেষ্ট হবে, যে সম্পর্কে এই মাত্র আমরা আলোচনা করেছি। আর উপসাগরীয় যুদ্ধেও এ অস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে অর্থাৎ ইলেক্ট্রনিক এবং আকাশ থেকে আকাশে নিক্ষেপনযোগ্য অস্ত্র (Electronic and space weapons) উপরন্তু এতদসঙ্গে এখানে রাসায়নিক অস্ত্র সম্পর্কেও আলোচনা করা হবে।

আমরা এই মাত্র লক্ষ্য করেছি যে,

(1) The Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies- October 1967.

(2) The Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere in Outer Space and under water- August 1963.

(3) The Convention On the Prohibition of Militery or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques- 1977.

(4) The Soveit-US Treaty on the Limitation of Anti Ballistic Missile Systems-1972.

এতসব চুক্তি আর কড়াকড়ি থাকা সত্ত্বেও উপসাগরীয় যুদ্ধে এসব চুক্তি পুরোপুরি বা আংশিক লংঘন করা হয়েছে এবং এসব উপকরণের যথেচ্ছ ব্যবহার হয়েছে।

একথা নিতান্ত স্পষ্ট যে, কোন একটি শক্তির উপর হামলা করা হলে সে শক্তি যদি আত্মরক্ষা মূলক প্রতিরোধ করার পরিবর্তে আক্রমনাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলে তাহলে আমেরিকা মহাকাশের যথেচ্ছ ব্যবহার করবে। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, আগামী যুদ্ধে ICBM এবং Mass Destruction এর পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের সম্ভাবনা যতটা হ্রাস পেয়েছে, ততটাই বেড়ে গেছে Intermediate Ballistic Missile এবং ব্যাকটিরোলজিক্যাল ইত্যাদি অস্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহারের সম্ভাবনা। কিন্তু যে অস্ত্রটি ব্যবহারের সম্ভাবনা সর্বাধিক বাড়বে, তা হচ্ছে ইলেক্ট্রনিক এবং আকাশ থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য অস্ত্র (Electronic & Space Weapons)

বর্তমানে আমরা যেটা প্রত্যক্ষ করছি অর্থাৎ সার্বিয়ার উপর ন্যাটো হামলা এবং উপসাগরীয় যুদ্ধে পরিচালিত Desert storm এর ওপর আরো এক ধাপ অগ্রগতি, সেটা হচ্ছে অতি সম্প্রতি এযুগের সবচেয়ে উন্নত কৌশলগত,

ইলেকট্রনিক এবং মহাকাশ যুদ্ধ যা পরিচালিত হয় যুগোশ্লাভ ফ্রন্টে। যদিও এ যুদ্ধের ধরণ প্রতিরোধমূলক মুকাবিলার চেয়ে এখনো সম্মুখে অগ্রসর হয়নি (২৬ এপ্রিল ১৯৯৯)।

পরবর্তী হামলা যদি পরিচালিত হয় কোন মুসলিম দেশের উপর এবং এককভাবে গোটা মুসলিম বিশ্ব অনেক মূল্য দিয়েও সে হামলা রোধ করতে চায়, তবুও সে তা করতে পারবেনা। কারণ হামলা করার বা যুদ্ধ করার একক ঠিকাদারী এখন কেবল প্রশ্চাত্যের হাতে রয়েছে। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় মুসলিম জাহান এখনো Minimum Credible Deterrent তথা ন্যূনতম বিশ্বাসযোগ্য নিবর্তক ব্যবস্থা আয়ত্ব করতে পারেনি। এ কারণে মুসলিম বিশ্ব এককভাবে এমন কোন আক্রমণ রোধ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আর প্রাশ্চাত্য কোন শক্তিকে Minimum Credible deterrent হওয়ার সুযোগ দেবে, তা অসম্ভব। কারণ, এটা হবে পাশ্চাত্যের জন্য আত্মহত্যার সমার্থক। এ কারণে মুসলিম বিশ্ব এমন যুদ্ধকে এক মাসের বেশী সময় ঠেকাতে পারবেনা।

এমন একটা হামলা আসন্ন বলে পর্যবেক্ষক মহলের প্রবল ধারণা এবং বাহ্যত: এর সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে বলেও মনে হয়। সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় পরবর্তী Flash point হবে মসজিদে আকসা বা বায়তুল মুকাদ্দাস। এটা স্পষ্ট যে, এরপর যে যুদ্ধ শুরু হবে, তা হবে এক সর্বাত্মক যুদ্ধ, যাকে নিঃসন্দেহে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নাম দেয়া যেতে পারে। কারণ এর ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়ার উপর (Chain Reaction) কারো কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। প্রথমে সাধারণ যুদ্ধ হিসাবে ছড়িয়ে পড়লেও পরবর্তীতে তা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের রূপ ধারণ করবে। আর যখন এমনটি হবে (শুরু হওয়ার পর বড়জোর দু'মাস বা এর চেয়েও কম সময়ের মধ্যে এ রূপ পরিগ্রহ করবে) এবং তখন তা সম্মুখে আক্রমনাত্মক প্রতিরোধের চেয়েও বড় কিছু হবে।

সর্বাত্মক বিস্ফোরণ

ওয়াকিফহাল মহল ভালোভাবেই অবগত আছেন যে, সার্বিয়া বা ন্যাটো যুদ্ধের যে পটভূমি বলা বা দেখানো হচ্ছে, বর্তমানে কিন্তু তা নেই। সন্দেহ নেই যে, বাহ্যত এটা কসোভোর মুসলমানদের উপর সার্বিয়ার জুলুম। মুসলিম গণহত্যা, তাদেরকে বাসা-বাড়ি থেকে নির্বাসিত করা এবং আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্ব শাসন থেকে বঞ্চিত করার জন্য এ যুদ্ধ- এমন কথাও বলা যেতে পারে। কিন্তু এগুলো এমনসব সমস্যা, যেগুলোকে পাশ্চাত্য দেশগুলো কুরে কুরে ক্ষতে পরিণত করেছে। এসবের আড়ালে তারা নিজেদের আসল মতলব পূরণ করতে চায়। বলকান যুদ্ধের বর্তমান অবস্থা জানার জন্য তিনটা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা জরুরী!

(১) এর আসল মতলব কি?

(২) এ মতলব পূরণ করার জন্য কি করা হচ্ছে?

(৩) এর ফলাফল কি দেখা দিতে পারে?

কসোভোর মজলূম মুসলমানদের সঙ্গে এর আসল মতলবের কোন সম্পর্ক নেই। ইহুদীরা এটা বিশ্বাস করে বসে আছে যে, মধ্যপ্রাচ্যে একটা সর্বাত্মক বিস্ফোরণ (Total Blast) ঘটবে। চাই তা ইহুদীরা একতরফাভাবে এবং উদ্যোগী হয়ে করুক, অথবা ফিলিস্তীনীদের কোন অভিযানের ছুতা ধরে করুক। যাই হোক এই সর্বাত্মক বিস্ফোরণ ঘটানো বর্তমানে ইহুদীদের প্রধান অগ্রাধিকার। আর এই সর্বাত্মক বিস্ফোরণের অপরিহার্য পরিণতি হবে যুদ্ধ। এ যুদ্ধে গোটা মুসলিম বিশ্বের মুসলমানদের উপর বিজয়ী হওয়ার জন্য ইসরাইলকে চেষ্টা চালাতে হবে। বিগত ৩০ বৎসর ধরে এই Flash Point এর প্রস্তুতি চলছে। এর অধীনেই মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ফিলিপাইন থেকে আরব উপসাগরে আনা হয়েছে। সউদী আরব, কুয়েত, মিসর, বাহ্‌রাইন, কাতার, আরব আমিরাত, ওমান, ইয়ামান, সোমালিয়া এবং অন্যান্য আফ্রিকান দেশগুলোতে বর্তমানে যে ক্রমবর্ধমান মার্কিন সৈন্য সমাবেশ ঘটানো হচ্ছে, তা এরই নূতন রূপ। ইয়ামান আমেরিকার কথা মেনে নিলে ফিলিপাইনের মার্কিন সামরিক ঘাঁটি যথারীতি ইয়ামানে স্থানান্তরিত হবে এবং ইয়ামানের সকুতরাহ হবে এর কেন্দ্রস্থল। (২৬ এপ্রিল ১৯৯৯ জেনারেল জিনির (Gen. Zinnei) ইয়ামান সফর এটাকে চূড়ান্ত রূপ দেয়ার একটা প্রচেষ্টা)। কোন যুদ্ধের জন্য কেবল এতটুকুই যথেষ্ট নয়,

তাই ফ্লাশ পয়েন্টের উত্তর পশ্চিমে ইহুদী শক্তিকে আরো সামনে অগ্রসর করানো অতীব প্রয়োজনীয় অনুভূত হয়। যেন এর ফলে সে Closer Operation Range- একটা ঘাটিতে আবদ্ধ হয়ে থাকে। পাশ্চাত্যের বর্তমান অবস্থাকে দু'উপায়ে পূরণ করা হয়। প্রথম উপায়ের সমাপ্তি ঘটে ন্যাটোর আওতায় ভার্সাই চুক্তিভূক্ত দেশগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। এমনকি এজন্য রাশিয়াকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। দ্বিতীয় উপায় রূপায়নের প্রয়োজন ছিল এজন্য যাতে এখন পর্যন্ত জার্মানীতে নিয়োজিত সামরিক ঘাঁটি আরো পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ফ্লাশ পয়েন্টের একেবারে কাছাকাছি আসতে পারে। এরকম করা অসম্ভব ছিল যতক্ষন না সেই বৃহৎ সামরিক স্থাপনাকে আরো এগিয়ে আনার জন্য যুক্তিযুক্ত বৈধতা সৃষ্টি করা হয়। কসোভোর ক্ষতকে কুরে কুরে সেই যৌক্তিক বৈধতা সৃষ্টি করা হয়। এভাবে পাশ্চাত্য তার উন্নত সামরিক মেশিনারীকে এখন বায়তুল মুকাদ্দাসের ফ্লাশ পয়েন্টের একেবারে নিকটে নিয়ে এসেছে।

বস্তুত: এই গোটা কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য এই বিশ্ব যুদ্ধের জন্য জেরুসালেম ফ্রন্ট (Jerosalem Theatre) প্রস্তুত করা, যার বারুদে ইহুদীরা এখন অগ্নি সংযোগ করবে। এতে দু'টি উদ্দেশ্য পুরুণ করা হচ্ছে। জেরুসালেম ফ্রন্ট প্রস্তুত করার আকারে এবং তা ব্যবহার করা উপলক্ষে পাশ্চাত্যকে দু'টি Potential Danger তথা মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হতে হতো। প্রথম Potential Danger হচ্ছে খৃষ্টানরা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইওরোপের মুসলমানরা।

খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে তাদের রয়েছে দু'টি আশংকা। প্রথম আশংকা এই যে, এখন আর তারা পাশ্চাত্যের সঙ্গে থাকবেনা এবং এমন করে তারা Strategic & Logistic সমস্যা সৃষ্টি করবে। তাই তারা রোমান ক্যাথলিক হোক, বা অর্থোডক্স চার্চ (রাশিয়ান অর্থোডক্স চার্চ, গ্রীক অর্থোডক্স চার্চ এবং আর্মেনিয়ান অর্থোডক্স চার্চ) খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় আশংকা নিতান্ত অস্বাভাবিক এবং গুরুতর। অভিজ্ঞ মহল জানেন যে, মুসলমানদের ব্যাপক অবহেলা অমনোযোগিতা, অজ্ঞতা আর ত্রুটি সত্ত্বেও বিগত ১৫০ বৎসরে খৃষ্টানদের ধর্ম বিশ্বাস আর দর্শনে বিপ্লব সূচিত হয়েছে। তারা কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, দীন ইসলাম এবং মুসলিম উম্মাহ্‌র অনেক কাছাকাছি এসে

গেছে। তারা শতশত মাইল অগ্রসর হয়ে দরজায় এসে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু আমাদের দরজা খোলার তাওফীক হচ্ছেনা- এটা কেবল আমাদের আলেম সমাজ, বুদ্ধিজীবী এবং দণ্ডমুণ্ডের মালিকদের চরম অজ্ঞতা-মূর্খতা এবং দুষ্কর্মের ফসল। তারা যে ইসলামের দরজা পর্যন্ত উপস্থিত হয়েছে এটা আমাদের কারণে নয়, বরং এর কারণ হচ্ছে হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম এবং হযরত মারইয়াম আলাইহিস সালামের প্রতি প্রকৃত খৃষ্টানদের অকৃত্রিম ভালবাসা। এই দুই ব্যক্তিত্বের প্রতি তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা তাদেরকে অনুসন্ধানের সে মনযিলে এনে দাঁড় করিয়েছে, যেখানে তারা কুরআন মজীদ, হাদীস শরীফ এবং ইসলামের কাছে এসেছে। এখন সে দিন দূরে নয়, যখন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আগমন করবেন এবং গোটা খৃষ্টান জগত ইসলামের কোলে আসবে। একথা বলেছেন সত্যনবী (স)। তাঁর বাণী নিশ্চিত সত্যে পরিণত হবে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ক্রুশ ছিন্ন করবেন এবং শুকর বধ করবেন।

ইহুদীরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছে যে, এমন হলে সমস্ত অর্থোডক্স খৃষ্টান মুসলিম মিল্লাতের অংশ হয়ে যাবে এবং তাদের অঞ্চল দুশমনের অঞ্চলে (Hostile Land) পরিণত হবে। সুতরাং অর্থোডক্স খৃষ্টানদের গোটা এলাকা ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসা অথবা Potential Danger স্থানগুলো ধ্বংস করা ছিল তাদের জন্য নিতান্ত জরুরী। সে কারণে পশ্চিম ইউরোপ থেকে পাশ্চাত্য শক্তি এক দিকে অর্থোডক্স চার্চের অঞ্চলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে (যথা ইটালী, গ্রীস এবং যুগোশ্লাভিয়া) আর অন্য দিকে সার্বিয়ার Potentials তথা সম্ভাবনা নস্যাৎ করার জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

এ অঞ্চলের অপর Potential Danger তথা প্রচ্ছন্ন বিপদ হলো মুসলমান এবং তাদের বিপুল জনসংখ্যা। এজন্য বিগত ১২ বৎসর ধরে নানা অজুহাতে তাদেরকে ঘরছাড়া করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। প্রথমে ঐক্যবদ্ধ যুগোশ্লাভিয়ার মুসলমানদেরকে পাইকারী হারে হত্যা করা হয়। এরপর রুমানিয়া এবং বুলগেরিয়ায় মুসলমানদেরকে হত্যা করানো হয়। Mass Exodus তথা গণ বিতাড়নের কাজ করা হয় আলবেনিয়া থেকে। অতঃপর গণহত্যা চালানো হয় বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, ক্রোশিয়া এবং সার্বিয়ায়। আর এখন কসোভোসহ গোটা সার্বিয়া থেকে মুসলমানদেরকে জন্তু

জানোয়ারের মতো বিতাড়িত করে নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। এভাবে জেরুসালেম ফ্রন্টের পাশ্চিমাঞ্চল উভয় Potential Danger অর্থাৎ অর্থোডক্স খৃষ্টান এবং মুসলমানদের দিক থেকে মূল্যহীন হয়ে নিরাপদ হবে। এমনিভাবে অতিক্রুত, এমন একটা জেরুসালেম ফ্রন্ট গড়ে তুলতে হবে, যা এই সর্বাত্মক বিস্ফোরণের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত থাকবে। এখন এই প্রস্তুতি ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছে (২০ এপ্রিল ১৯৯৯)। সুতরাং সর্বাত্মক বিস্ফোরণ কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত প্রায়। একেই বলা হয় ন্যাটো ঘোষণা (২৫ এপ্রিল ১৯৯৯)।

আমরা আগের আলোচনায় ফিরে যাই। আমরা পর্যালোচনা করে দেখছিলাম- দ্বিতীয় দৃষ্টকোণ থেকে আক্রমণাত্মক প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন দেখা দেবে। এ ক্ষেত্রে এটা নিশ্চিত যে, পাশ্চাত্য জগৎ তথা বৃহৎ শক্তি মহাশূন্যকে ব্যবহার করে এক উন্নত ও জটিল ইলেক্ট্রনিক ও আকাশ যুদ্ধ শুরু করবে। এ ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহকে কমপক্ষে ৭টি মারাত্মক অস্ত্রের সম্মুখীন হতে হবে।

এখানে একটা কথা বলে রাখছি যে, মুসলিম উম্মাহ্ কোন যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও তার কেবল একটা উপায়ই থাকতে পারে এবং তা এই যে, তাদেরকে অন্তত একটা Minimum Credible Deterrent তথা ন্যনতম নির্ভরযোগ্য নিরোধক অর্জন করতে হবে, যা হবে পরিচিত অর্থে Star war তথা তারকা যুদ্ধের বিবেচনায় নিরোধক (Deterrent)। আমার ক্ষুদ্র মতে এর চেয়ে ক্ষুদ্র কোন উপায় নির্ভরযোগ্য এবং কার্যকর হবে না। দু'য়ে দু'য়ে মিলে চার হয়- একথা যেমন নিশ্চিত, তেমন নিশ্চিত ভাবে একথা জানা উচিত যে, বর্তমান বিশ্বে কেবল ইহুদীরা-ই সে স্থানের অধিকারী, যাকে বলা চলে Absolute Position in world Supremecy তথা বিশ্বময় আধিপত্যের নিরংকুশ স্থান। আর এ প্রসঙ্গে ইহুদীরা নিম্নোক্ত Systems গড়ে তুলেছে ঃ

(১) SAINT Interceptor Satellite এটা হচ্ছে একটা Maneuverable Space Apparatus. এ সম্পর্কে ষাটের দশকে ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপনযোগ্য দু'টি Anti Satellite system স্থাপন করা হয়। ১৯৬৩ সালে কোয়াজালীন দ্বীপে (Kwajaleen Island) Nike- Zeus Anti Ballistic Missilells স্থাপন করা

হয় এবং অপরটি স্থাপন করা হয় জনষ্টোন দ্বীপে (Johnston Island) থোর মিসাইলের (Thor Missiles) পরিবর্তে এই সিষ্টেমকে Airborne anti Satellite System (ASAT) পরিবর্তন করা হয় এবং তা স্থাপন করা হয় ১৫-এফ ফাইটার বিমানে।

(২) Shuttle Spaceship Programme এই প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে Pentagon orbital Command Post সহ আরো নানা ধরনের Space Weapon. প্রথমে Vandenburg Air Force Base থেকে এ প্রোগ্রাম শুরু করা হয়। বর্তমানে তা আরো অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উপসাগরীয় যুদ্ধের পর যাহরান এবং রাবউল খালীর মরুপ্রান্তরে সম্ভবত এ ধরনের Space Shuttles এর জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে বড় বড় বিমান ঘাঁটি আর এসবই রয়েছে পাশ্চাত্যের নিয়ন্ত্রণে।

(৩) Directed Energy Weapons. আর এটা হচ্ছে Laser and charged particle Beam অস্ত্র। উপসাগরীয় যুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী কালে এসব অস্ত্রের ব্যবহার হয়েছে এবং বর্তমানে সার্বিয়ায় ব্যবহার হচ্ছে।

(৪) এন্টি ব্যালিষ্টিক মিজাইল সিষ্টেম। এটা আসলে ইহুদীদেরকে First Strike Capability দিতে পারে এমন একটা সিস্টেম। এই সিস্টেম আকাশ যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রতিটি চুক্তি নস্যাৎ করেছে। বর্তমানে সে সব চুক্তির কোনমূল্য নেই।

(৫) Space Command ইহুদীরা সৌরজগতের অন্তত চারটি গ্রহ পৃথিবী, বুধ, মঙ্গল, শুক্র এবং চন্দ্র (Earth, Mercury, Mars, Venus and Moon) এর বুকে জল-স্থল এবং বিমান বাহিনীর এক যৌথ কম্যান্ড স্থাপন করে নিয়েছে। আর এই সুবাদে নূতন করে চেষ্টা শুরু হয়েছে Space Command Complex স্থাপন করার। ১৯৯৮ সালে মহাশূন্যে এ কম্যান্ড স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে এবং ২০০৪ সালে পর্যন্ত সম্পন্ন হবে। এই কম্যান্ডের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হবে ইহুদীদের Anti Satellite System এর কাজ।

গোপনীয় ও ধ্বংসাত্মক বিষয়গুলো

২৫ এপ্রিল ১৯৯৯ সালে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত ন্যাটো সম্মেলনে গৃহীত নয়া ন্যাটো চুক্তিতে উল্লেখিত New Strategic Concept কি এবং তাতে কি কি বিষয় লুকানো আছে? এই নয়া চুক্তির প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আগামী ৫০ বছরের জন্য Advance Security and Freedom - কে নিশ্চিত করার কথা বলে। নিশ্চিত করার ব্যাপারে আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হবে। এই চুক্তির অধীনে ন্যাটোর নতুন দায়িত্ব হবে "To Confront Crises beyond their borders, Protection from terrorism and weapons of mass destruction" অর্থাৎ সীমান্তের ওপারের সংকট মুকাবিলা করা, সন্ত্রাস আর ব্যাপক ধ্বংসকরী মারণাস্ত্র থেকে রক্ষা করা।

বিশেষ ধারায় বর্ণিত চুক্তির সরল অর্থ এই দাঁড়ায়-

(১) ইসলাম মানে সন্ত্রাস

(২) মুসলামন মানেই সন্ত্রাসী

(৩) ইসলাম মেনে চলা সরকার, সন্ত্রাসী সরকার

(৪) ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টারত সমাজ, সন্ত্রাসী গোষ্ঠি

(৫) মুসলিম উম্মাহর পরিমাণবিক অস্ত্র লাভের চেষ্টা করা বড় সন্ত্রাস।

সুতরাং এসব রোধ করা হবে ন্যাটোর পরবর্তী দায়িত্ব। স্পষ্টত আইনের পরিভাষায় এর অর্থ দাঁড়ায় ঃ

(১) সন্ত্রাসী ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি (Liquidation of outlaw or terrorist System)

(২) সন্ত্রাসী দেশের পরিসমাপ্তি (Liquidation of outlaw or terrorist Countries)

(৩) সন্ত্রাসী সমাজের পরিসমাপ্তি (Liquidation of outlaw or terrorist Societies)

(৪) সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর বিনাশ (Liquidation of outlaw or terrorist Groups & Outfits)

(৫) সন্ত্রাসী ব্যক্তিত্বের বিনাশ (Liquidation of outlaw or

terrorist Personalities)

(৬) সন্ত্রাসী ব্যক্তিদের বিনাশ (Liquidation of outlaw or terrorist individuals)

এখানে ব্যক্তিত্ব অর্থ এমন সব উজ্জ্বল ব্যক্তিবর্গ, যারা ইসলাম বাস্তবায়নের কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন এবং তৎপর। তাদের সম্পর্ক আলেম সমাজ, বুদ্ধিজীবী, মাশায়েখ বা মুজাহিদ, যার সঙ্গেই থাকুকনা কেন। এই চুক্তির একটা কথা অত্যন্ত মারাত্মক। আর তা হচ্ছে- Beyond their borders মানে তাদের সীমান্তের ওপারে। ন্যাটোর মাধ্যমে তাদের ভাষায় নিরাপত্তা আর স্বাধীনতা উন্নত করার নিমিত্ত তাদের সীমান্তের ওপারে সন্ত্রাস আর ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিনাশ করার স্পষ্ট অর্থ হচ্ছে গোটা মুসলিম উম্মাহ, তাদের শক্তিশালী রাষ্ট্র, ব্যক্তিত্ব এবং সমুদয় দীনদার ব্যক্তিবর্গের ওপর প্রকাশ্যে আক্রমণ চালিয়ে তাদের বিনাশ সাধান করা।

এই শিকারের সূচনা কেমন হবে এবং তার চূড়ান্তরূপই বা কিভাবে সম্মুখে উপস্থিত হবে? বাস্তব সত্য এই যে, সমস্ত সন্ত্রাসী দেশের অবস্থা শুরুতে তাই হবে, যে অবস্থা হচ্ছে বর্তমানে ইরাকের। আর সকল সন্ত্রাসী সমাজের অবস্থা তাই হবে, যে অবস্থা হয়েছে মিসরে ইখওয়ানের। আর সকল সন্ত্রাসী ব্যক্তিত্বের অবস্থা তাই হবে, যে অবস্থা হচ্ছে বিন লাদেনের মতো ব্যক্তিত্বের। এমনকি প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তি, যে ইসলামের কোন হুকুম অনুযায়ী আমল করে, তাকেই সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করা হবে এবং ইসলামের প্রতিটি আমল- তা সালাত সাওম-যাকাত আর হজ্জ যাই হোক না কেন, তা সন্ত্রাসী কার্য বলে চিহ্নিত হবে। এই অজুহাতে মসজিদ মাদ্রাসা বন্ধ করা হবে। নামাজ রোজার উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হবে। হজ্ব নিষিদ্ধ করা হবে। কথা এখানেই শেষ নয়; গোপনে এবং ব্যক্তিগতভাবে এসব ইবাদাত করাও সন্ত্রাস বলে আখ্যায়িত করা হবে। যে শয়তানী শক্তি গোটা দুনিয়াকে হাতের তালুর মতো এক নজরে দেখছে, তার গোয়েন্দা বাহিনীর লোকজন প্রতিটি কর্মকান্ডের চুলচেরা খবর দেবে- কোথায় কোন্ গুহায় আর কোন্ মাঠে আল্লাহ্র কোন্ বান্দা নামাজ আদায় করছে। এক দিকে সে নামাযের নিয়ত করছে আর অন্য দিকে দুনিয়ার অপর প্রান্ত থেকে বা তার আশাপাশ থেকেই ক্ষেপ্রণাস্ত্র এসে তার গায়ে পড়বে। মারা যাবে অনেক লোক। এ অবস্থায় লোকেরা ইসলামের এক একটা আমল ত্যাগ করা শুরু

করবে। এমনকি নামাজ অস্বীকারও করবে। সম্ভবত: এ অবস্থা সম্পর্কেই বলা হয়েছেঃ

بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا ويمسى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا - (مسلم)

'সে সব ফিতনার মোকাবিলার জন্য এখন থেকে কাজ শুরু কর, যা হবে অন্ধকার রাত্রের টুকরার মতো। যাতে এক ব্যক্তি সকালে মু'মিন আর বিকালে কাফির আবার বিকালে মু'মিন এবং সকালে কাফির হয়ে পড়বে। সে তার দীনকে বিক্রী করবে দুনিয়ার মামুলী পণ্যের বিনিময়ে।' (মুসলিম)

এমন অবস্থায় কোন আল্লাহ্‌র বান্দা যদি আল্লাহ্‌র ইবাদাতকে প্রাধান্য দেয় তবে সে যেন নিজের মৃত্যুকেই ডেকে আনবে। এমন অবস্থায় ইবাদাত করা মহানবী (স) এর প্রতি হিজরত করার সমান হবে। মহানবী (স) বলেন ঃ

العبادة فى الهرج كهجرة الىّ - (مسلم)

'প্রকাশ্য মৃত্যু আর গোলযোগের মধ্যে ইবাদত করা আমার দিকে হিজরত করা মতো।' (মুসলিম)

এই পরিস্থিতি আরো স্পষ্ট করে মহানবী (স) বলেছেন ঃ 'এটাই হচ্ছে কালো অন্ধকার ফিতনা।' হাদীস শরীফের ভাষা এরকম-

ثم فتنة الدهيماء لاتدع احدا من هذه الامة الا لطمته لطمة فاذا قيل انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسى كافرا حتى يصير الناس الى فسطاطين فسطاط ايمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا ايمان فيه فاذا كان ذلك فانتظروا الدجال من يومه أو من غده - (أبو داؤد)

'অতঃপর দেখা দেবে কালো অন্ধকার ফিতনা। এমন কেউ উম্মতের মধ্যে থাকবেনা, যে এর খপ্পর থেকে রক্ষা পাবে। এই ফিতনা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হতে থাকবে। এমন কি তাতে এক ব্যক্তি সকালে মু'মিন আর বিকালে কাফির হবে। তখন মানুষ দু'টি শিবিরে বিভক্ত হবে। ঈমানের শিবিরে মুনাফেকী থাকবেনা এবং মুনাফেকীর শিবিরে ঈমানও থাকবেনা (বাহ্যত উভয় শিবির হবে মুসলমানদের)। পরিস্থিতি যখন এমন হবে,

তখন দাজ্জালের জন্য অপেক্ষা করবে। আজ-কাল যে কোন সময় সে আত্মপ্রকাশ করবে।' (আবু দাউদ)

আগামী দিনে যে যুদ্ধ সংঘটিত হবে, তা হবে দাজ্জালের আগমনের পথ পরিষ্কার করার জন্য এবং এ যুদ্ধের এক পক্ষ আবশ্যিক ভাবেই হবে মুসলিম উম্মাহ্।

অগ্রাধিকার

এহেন পরিস্থিতিতে দু'টি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথম প্রশ্নঃ এমন কোন যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়া কি সম্ভব? দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ সম্ভব না হলে কি করতে হবে?

প্রথম প্রশ্নের জবাবে বলা যায়- দীর্ঘ সময় ধরে এমন যুদ্ধ এড়িয়ে চলা কিছুতেই সম্ভব নয়। এমন ধারণা কেবল স্বপ্নই হতে পারে। অবশ্য একটা কথা থেকে যায় যে, স্বল্প সময়ের জন্য এমন যুদ্ধ এড়িয়ে চলা যায় কিনা? এ প্রশ্নের জবাব: হ্যাঁ, এটা সম্ভব। তবে এটা তখন সম্ভব, যখন গোটা মুসলিম উম্মাহ্ এই আসল বিপদকে (Actual Danger) সচেতন ভাবে চিহ্নিত করবে এবং সে জন্য কাল বিলম্ব না করে Minimum Credible Deterrent তথা ন্যূনতম বিশ্বাসযোগ্য প্রতিরোধক অর্জন করার চেষ্টা চালাবে। এ জন্য বছরের পর বছরের সুযোগ থাকবেনা ; সুযোগ থাকতে পারে মাত্র কয়েক মাসের।

আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, আসল সত্য কথা এই যে, উম্মতকে রক্ত সাগরে সাঁতার কেটেই অগ্রসর হতে হবে। তার কাছে কোন বিকল্প নেই। সুতরাং এখন দেখার বিষয় থাকে কেবল একটিই। আর তা এই যে, এমন যখন ঘটবেই, তখন উম্মত কিভাবে তার সম্মুখীন হবে? এ সম্পর্কে সর্বপ্রথম নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে এটা জানতে হবে যে, ভবিষ্যতে মুসলিম উম্মার পদ-মর্যাদার কি অবস্থা হতে পারে? এ তথ্য থেকেই ধারণা করা যাবে যে, মুসলিম উম্মাহকে তার পদ-মর্যাদা রক্ষা করার জন্য কি করতে হবে? এমন নির্ভরযোগ্য মাধ্যম কেবল আল-হুদা তথা কুরআন মজীদ এবং মহানবীর পবিত্র হাদীস হতে পারে। ভবিষ্যতে মুসলিম উম্মাহর পদ-মর্যাদা প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে তিনটি কথা বলা হয়েছে।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ

الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا –

'আর এ ভাবেই আমি তোমাদেরকে করেছি মধ্যপন্থী উম্মত, যাতে তোমরা সাক্ষী হও মানুষের ওপর এবং রাসূল সাক্ষী হন তোমাদের উপর।' (সূরা বাকারা ঃ ১৪৩)

এ আয়াত থেকে একথা নির্ণীত হয় যে, এ উম্মত হচ্ছে মধ্যপন্থী উম্মত। আর তার পদ-মর্যাদার আলোকে তার দায়িত্বই হচ্ছে মানুষের উপর সাক্ষ্যদাতার কর্তব্য পালন করা।

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ –

'তোমরা হলে সর্বোত্তম জাতিগোষ্ঠী। মানবতার কল্যাণের জন্য তোমাদের সৃষ্টি। তোমরা ভালো কাজের নির্দেশ দেবে আর মন্দ কাজে বারণ করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে।' (আলে ইমরান ঃ ১১০)

এ থেকে একথা নির্দিষ্ট হয় যে, গোটা মানব জাতির নিকট ইতিবাচক, এবং সম্মুখে অগ্রসর হয়ে নিজের পদ-মর্যাদার দায়িত্ব পালন করা মুসলিম উম্মার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰـؤُلَاءِ شَهِيْدًا –

'কেমন হবে, যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করবো এবং তোমাকে সাক্ষী করবো এদের উপর।' (সূরা নিসা ঃ ৪১)

এ আয়াত থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, হিসাব কিতাবের দিন সাক্ষ্য পেশ করার পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ্র উপর এ দায়িত্ব বর্তায়। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিশ্বের বুকে যদি একজন মু'মিনও বেঁচে থাকে, সাক্ষ্য দান করা হবে তার পদ-মর্যাদার কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে শেষ স্তর পর্যন্ত পৌছার দায়িত্ব যথারীতি বহাল থাকে। আর তা হচ্ছে সর্বোত্তম এবং সর্বশেষ স্তর। অর্থাৎ জিহাদ-বিস্‌সাইফ তথা তরবারির দ্বারা জিহাদ। মহানবী (স) বলেনঃ

الجهاد ماض منذ بعثني إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال ، لا يبطله جور جائر وعدل عادل –

'আল্লাহ্ আমাকে যখন প্রেরণ করেছেন, তখন থেকে নিয়ে আমার উম্মতের সর্বশেষ ব্যক্তি দাজ্জালের সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া পর্যন্ত জিহাদ অব্যাহত থাকবে। কোন জালিমের জুলুম আর কোন ন্যায়পরায়ণের ন্যায়পরায়ণতা তাকে রহিত করতে পারেনা।'

মহানবী (স) আরো বলেন ঃ

لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة .

'কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত এই দীন কায়েম থাকবে এবং একটা দল দীনের জন্য জিহাদ অব্যাহত রাখবে।' (মুসলিম) মহানবী (স) আরো বলেনঃ

لاتزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى قاتل أخرهم المسيح الدجال -

'আমার উম্মতের একটা দল সর্বদা সত্যের উপর জিহাদ করবে, তাদের সঙ্গে যারা দুশমনী করবে, তাদের উপর এ দলটি জয়ী হবে। তারাই হবে শেষ দল, যারা মসীহ্ দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াই করবে।' (আবু দাউদ)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ার বুকে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করেছেন, যার সাক্ষ্য দিয়েছেন আল্লাহ্ নিজেই ঃ

اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَاتَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ع اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الاِسْلَامَ دِيْنًا -

'আজ কাফেররা তোমাদের দীন সম্পর্কে হতাশ। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করবেনা, ভয় করবে আমাকে। আমি আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পরিপূর্ণ করলাম, আমার নিয়ামত তোমাদের উপর সমাপ্ত করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসাবে পছন্দ করলাম।' (আল-মায়িদাহ ঃ ৩)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর দীনের এই প্রতিষ্ঠাকে অটুট রাখা গোটা উম্মতের পদ-মর্যাদার কর্তব্য। তাইতো এই দায়িত্ব চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত ভালোভাবে পালন করার জন্য গোটা উম্মতকে সংঘবদ্ধ থাকা

এবং তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছেঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَاتَعْلَمُوْنَهُمْ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَاتُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَاتُظْلَمُوْنَ.

'তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে, এতদ্বারা তোমরা আতংকিত করবে আল্লাহর দুশমন এবং তোমাদের দুশমনকে এবং এতদ্ব্যতীত অন্যদেরকে, যাদেরকে তোমরা জাননা, আল্লাহ জানেন। আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।' (আল আনফাল ঃ ৬০)

যখন মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার সময় হয় মহানবীর, তখন মহানবী (স) এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রাখার নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ

من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه .

'যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণও সংগঠন ত্যাগ করবে, সে যেন তার গর্দান থেকে ইসলামের রজ্জু খুলে ফেললো।' (আহমদ, আবূ দাউদ)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন ঃ

من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية .

'যে ব্যক্তি ইসলামের সর্বোচ্চ ক্ষমতার কাঠামো থেকে এক বিঘত পরিমাণও বেরিয়ে যাবে, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু মরবে।'

এসব আয়াত আর হাদীস শরীফ থেকে একথা স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট হয়ে যায় যে, পদ-মর্যাদার যে দায়িত্বে মুসলিম উম্মাহকে নিয়োজিত করা হয়, কিয়ামত পর্যন্ত তাতে সামান্য পরিমাণ পরির্বতনও হবেনা। সুতরাং এ বিষয়টা চূড়ান্ত যে, এই সরল রেখা ছাড়া অন্য কোন লাইনে উম্মতের চিন্তা করার প্রশ্নই ওঠেনা।

কর্মকৌশল ও বাস্তবায়নের উপায়

এ বিষয়টা যখন চিরতরে স্থির হয়ে গেছে যে, মুসলিম উম্মাহ্ তার পদ-মর্যাদার দায়িত্ব-কর্তব্য পরিত্যাগ করতে পারেনা, পারেনা ক্ষণিকের তরে জিহাদ বিসসাইফ তথা তরবারির মাধ্যমে জিহাদ ত্যাগ করতে তখন কোন অবস্থায়ই এ দায়িত্ব থেকে সে অব্যাহতি পেতে পারেনা এবং তার উপর থেকে এ দায়িত্ব রহিতও হয়না। সুতরাং এখন দেখতে হবে, বর্তমান আর ভবিষ্যতের প্রেক্ষিতে এই জিহাদ প্রসঙ্গে কি করা উচিত এবং কি করা যেতে পারে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরে কিয়ামত পর্যন্ত সময়কালের বিভিন্ন স্তর নির্ণয় করে বলেন ঃ

ان هذا الامر بدأ نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم ملكا عضوضا ثم كائن جبرية وعتوا وفسادا فى الارض الخ . (رواه البيهقى فى شعب الإيمان)

'এই দীনের সূচনা হয়েছে নবূওয়্যাত আর রহমতের মাধ্যমে, এরপর আসে খিলাফাত ও রহমতের যামানা। এরপর আসবে দুর্নীতি পরায়ন বাদশাহীর যমানা। এরপর দেখা দেবে বল প্রয়োগের যুগ, তারপর দেখা দেবে জুলুমের যুগ। এরপর চালু হবে বিশ্বে অরাজকতার ধারা........ (বায়হাকী)

এ পর্যায়ের অন্য বইগুলোতে একথা আলোচনা করা হয়েছে যে, ১৯২৪ সালে নামমাত্র খিলাফতের অবসানের ফলে এক বিবেচনায় বাদশাহী ও বল প্রয়োগ এবং অন্য বিবেচনায় জুলুমের যুগের অবসান ঘটেছে। এরপর সূচনা হয় অরাজকতার যুগের। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আগমন পর্যন্ত বিশ্বের বুকে অরাজকতার এ কালটা প্রলম্বিত হবে। দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বে তার সর্বশেষ প্রস্তুতির যুগ, এরপর তার আবির্ভাবের যুগ, এরপর তার অত্যাচারের যুগ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এরপর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আগমন করবেন এবং তিনি দাজ্জালকে হত্যা করে নবুওয়্যাত ও রহমতের যুগ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবেন। অন্যান্য বিবেচনায় একথা বলা যায় যে, ১৯২৪ সালে নামমাত্র খিলাফাতের অবসানের ফলে মূলত বাদশাহী ও বল প্রয়োগের যুগের অবসান ঘটেছে। এরপর থেকে জুলুমের যুগ চলছে। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী পৃথিবীতে অরাজকতার যুগ এখনো শুরুই হয়নি। এই

ব্যাখ্যা মতে পরিস্থিতিতে একটা পরিবর্তন হবে আর তা এই যে, দাজ্জালের আগমনের যুগ কিছুটা বিলম্বিত হবে। কিন্তু এই অধম যে ব্যাখ্যা করেছে এবং অন্যান্য লক্ষণ আর আলামত প্রকাশিত হওয়া দ্বারা যেদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাতে বুঝা যায় যে, ১৯২৪ সাল হচ্ছে পৃথিবীতে অরাজকতা শুরু হওয়ার চূড়ান্ত সাল।

মহানবী (স) অনেক হাদীসে তাঁর ওফাতের পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হিদায়াত দিয়েছেন, যাতে উম্মত তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সুচারু রূপে সম্পন্ন করতে পারে। এই সব হিদায়াত ভিতর বাহির উভয় পর্যায়ের জন্য। আভ্যন্তরীণ পর্যায় এই আলোচনায় তেমন জরুরী নয়। এ কারণে বাইরের পর্যায় সম্পর্কে এখানে কয়েকটা কথা নিবেদন করা হচ্ছে। এ পর্যায়ে দুটি বিষয় উল্লেখযোগ্য (১) সক্রিয়তা (২) যোগ্যতা আর প্রস্তুতি।

সক্রিয়তার পর্যায়ে কিয়ামত পর্যন্ত এ বিষয়টা চূড়ান্ত হয়ে গেছে যে, মুসলিম উম্মাহ্ ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত ভাবে তরবারি দ্বারা জিহাদে প্রবৃত্ত হতে বাধ্য। কিয়ামত পর্যন্ত এক মুহূর্তের তরেও মুসলিম উম্মাহ থেকে জিহাদ রহিত হতে পারেনা, উম্মতের কোন ব্যক্তি জিহাদ থেকে অব্যাহতি পেতে পারেনা।

যোগ্যতা আর প্রস্তুতি পর্যায়ে কুরআন নির্দেশ দিয়েছে এবং জিহাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যও নির্ণয় করে দিয়েছে যে, ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগতভাবে যোগ্যতা অর্জন করা এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করা উম্মতের ওপর ফরয। এই যোগ্যতা আর প্রস্তুতি তাকে অব্যাহত রাখতে হবে, এ জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে হবে এবং আলস্য ও ত্রুটি করতে পারবে না। কুরআন মজীদে এ পর্যায়ে বলা হয়েছে-

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ج وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ-

'তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত রাখবে, এতদ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করে তুলবে আল্লাহ্‌র দুশমন আর তোমাদের দুশমনদেরকে, এতদ্ব্যতীত অন্যদেরকে, যাদেরকে তোমরা জাননা, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আল্লাহ্‌র রাস্তায় তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদের দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবেনা।' (আল-আনফাল ঃ ৬০)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পর্যায়ে বিস্তারিত হিদায়াত দান করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول : وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا ان القوة الرمى ألا ان القوة الرمى ألا ان القوة الرمى . (مسلم)

'ওকবা ইবনে আমের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে শুনেছি, তিনি মিম্বর থেকে বলছিলেন; দুশমনের জন্য যথাসাধ্য সম্ভব শক্তি সঞ্চয় করবে। জেনে রাখবে, নিশ্চয়ই নিক্ষেপ হচ্ছে শক্তি, নিক্ষেপ করা হচ্ছে শক্তি, নিক্ষেপ করা নিঃসন্দেহে শক্তি।' (মুসলিম)

মহানবী (স) কতটা সুদূর প্রসারী কথা বলেছেন। আসল সত্য ও বাস্তব তত্ত্ব এই যে, ১৬৯৯ সালে যে মৌলিক কারণে ইসলামী শাসনের সমাপ্তি ঘটা শুরু হয়েছে এবং অবশেষে ১৯২৪ সালে ইসলামী শাসনের পরিপূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটেছে, তা ঘটেছে শক্তি সঞ্চয়ে ব্যর্থতার কারণে। নিক্ষেপ কেবল তীর নিক্ষেপই নয়।

قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ستفتح عليكم الروم ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم ان يلهوباسهمه .

'বর্ণনাকারী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ অবিলম্বে তোমরা রোম দেশ জয় করবে এবং আল্লাহ্ হবেন তোমাদের জন্য যথেষ্ট। তোমাদের মধ্যে কেউ যেন নিজের তীর নিয়ে মত্ত হয়ে অক্ষম হয়ে না পড়ে।' (মুসলিম)

قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من علم الرمى ثم تركه فليس منا أو قد عصى . (مسلم)

'বর্ণনাকারী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিক্ষেপ করা শিখার পর ত্যাগ করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, অথবা সে নাফরমানী করে।' (মুসলিম)

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة فى نواصى الخيل .(متفق عليه)

'বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ অশ্বের ললাটে বরকত নিহিত রয়েছে।' (বুখারী, মুসলিম)

এই হাদীসে خيل বা অশ্ব বলে কেবল ঘোড়া বুঝানো হয়নি, বরং যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি, শক্তি সঞ্চয় এবং জিহাদের নিমিত্ত পদাতিক বাহিনীর যাবতীয় প্রস্তুতি এর অন্তর্ভুক্ত। বরং এক হাদীসের শব্দমালা দ্বারা বুঝা যায় যে, কেবল পদাতিক বাহিনীই নয়, বরং নৌ আর বিমান বাহিনীর যাবতীয় প্রস্তুতিও এর অন্তর্গত।

عن جرير بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوى ناصية فرس باصبعيه وهو يقول الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الاجر والغنيمة . (مسلم)

'জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স) কে আপন অঙ্গুলী দ্বারা অশ্বের ললাট (এর পশম) ভাঁজ করতে দেখেছি। তখন তিনি বলছিলেন ঃ অশ্বের ললাটে বাঁধা থাকে মঙ্গল আর বরকত কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য অর্থাৎ সাওয়াব ও গণীমতের মাল।' (মুসলিম)

عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فان شبعه وريه وروثه وبوله فى ميزانه يوم القيامة . (بخارى)

'আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনে তাঁর ওয়াদায় বিশ্বাস স্থাপন করে যে ব্যক্তি

আল্লাহ্র রাস্তায় একটা অশ্ব বেঁধে রাখে, তার সে অশ্বের তৃপ্তি, তার পান করা, তার মল-মূত্র- সব কিছুই কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তির পাল্লায় স্থাপন করা হবে।' (বুখারী)

এসব আয়াত আর হাদীস থেকে কেবল একটা কথাই জানা যায় যে, সম্ভাব্য সকল উপায়ে উম্মতকে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এ কাজ করা উম্মতের জন্য ওয়াজিব। জিহাদের প্রস্তুতি অপরিহার্য কর্তব্য এবং এটা সর্বোত্তম আমল। আর এ ব্যাপারে ত্রুটি ও অবহেলা করা কঠোর গুনাহের কাজ।

অবশ্য এমন কিছু হাদীসও রয়েছে, যা থেকে জানা যায় যে, বাইরের স্তরে জিহাদ আর কিতালে অংশ নিতে আল্লাহ্র নবী নিষেধ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কয়েকটা হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

(١) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون فتن ، القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشى والماشى فيها خير من الساعى ، من تشرف لها تتشرفه فمن وجد ملجأ ومعاذا فليعذ به . (متفق عليه)

(১) 'বর্ণনাকারী বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ অদূর ভবিষ্যতে এমনসব ফিতনা দেখা দেবে, যাতে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির চেয়ে উপবিষ্ট ব্যক্তি হবে উত্তম। দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি চলাচলকারীর চেয়ে উত্তম। আর চলাচলকারী ছুটাছুটিকারীর চেয়ে হবে উত্তম। সে সব ফিতনার দিকে যে কেউ উঁকি মেরে দেখবে, তার দিকেই ফিতনা ধেয়ে আসবে। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন আশ্রয়স্থল পাবে, যে যেন তাতে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেখানেই আত্মগোপন করে।' (বুখারী, মুসলিম)

(٢) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون فتن الاثم تكون فتن الاثم تكون فتنة القاعد خير من الماشى فيها والماشى فيها خير من الساعى إليها الا فاذا وقعت فمن كان له ابل فليلحق بإبله ومن كان له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه فقال رجل يا رسول الله

أرأيت من لم يكن له إبل ولاغنم ولا أرض ، قال يعمد الى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينج ان استطاع النجاء اللهم هل بلغت ثلاثا فقال رجل أرأيت ان أكرهت حتى ينطلق بى إلى أحد الصفين فضربنى رجل بسيفه أو يجئ سهم فيقتلنى قال يبوء باثمه واثمك ويكون من اصحاب النار . (مسلم)

(২) 'বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ অদূর ভবিষ্যতে ফিতনা-বিপর্যয় দেখা দেবে। আবার জেনে রেখো, অবিলম্বে ফিতনা দেখা দেবে, শুনে রেখো, অনতিবিলম্বে ফেতনা দেখা দেবে। তাতে উপবিষ্ট ব্যক্তি গমনাগমনকারীর চেয়ে উত্তম হবে। সাবধান, যখন তা ঘটবে, তখন যার কাছে উষ্ট্র থাকবে, সে যেন আপন উষ্ট্রের নিকট গমন করে। যার বকরী থাকবে, সে যেন বকরীর নিকট গমন করে। আর যার ভূমি থাকবে, সে যেন ভূমিতে আত্মনিয়োগ করে। তখন এক বক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বলুন, যার নিকট উষ্ট্র, বকরী আর ভূমি কিছুই নেই (সে কি করবে?) আল্লাহ্র নবী বললেন ঃ সে তার তরবারি বের করে প্রস্তর দ্বারা তার ধার ভোঁতা করবে। অতঃপর পলায়ন করা সম্ভব হলে পলায়ন করবে। হে আল্লাহ্! আমি তাবলীগের দায়িত্ব পালন করেছি (একথা তিনি তিনবার বলেন)। তখন জনৈক ব্যক্তি বললো: আমাকে যদি কোন এক দলের অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য করা হয়? কেউ যদি তরবারি দ্বারা আমাকে হত্যা করে, বা কোন তীর এসে আমাকে হত্যা করে? আল্লাহ্র নবী বললেন ঃ সে তার এবং তোমার গুনাহ্ বহন করবে এবং জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' (মুসলিম)

(٣) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن . (بخارى)

(৩) 'বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ এমন এক সময় আসবে, যখন একজন মুসলমানের সর্বোত্তম সম্পদ হবে তার বকরী। সেগুলো নিয়ে

গিরি সে কন্দরে আশ্রয় নেবে, আশ্রয় নেবে বৃষ্টির স্থানে, আশ্রয় নেবে ফিতনা থেকে নিজের দীন আর ঈমানকে হিফাযত করার জন্য।' (বুখারী)

(٤) (الف) ان بين يدى الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسى كافرا ويمسى مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والماشى فيها خير من الساعى فكسروا فيها قسيكم وقطعوا فيها أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابنى آدم .

(৪) ক- 'মহানবী (স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামতের পূর্বে কিছু ফিতনা দেখা দেবে ঃ এসব দেখা দেবে অন্ধকার রাতের টুকরোর মতো। যাতে মানুষ সকালে মুসলমান হবে, আর বিকালে হবে কাফের। আর সকালে কাফের হবে, আর বিকালে হবে মুমিন। এতে উপবিষ্ট ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে। হেঁটে চলা ব্যক্তি দৌড়ে যাওয়া ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে। তখন তোমরা তোমাদের তীর-ধনুক-কামান ভেঙ্গে ফেলবে নিজেদের তাঁত ভেঙ্গে দেবে, নিজেরদের তরবারিতে প্রস্তরাঘাত করবে। আদমের সন্তান দ্বয়ের মধ্যে ভালো সন্তানের মতো আচরণ করবে।' (আবূ দাউদ)

(ب) وفى رواية له ذكر إلى قوله خير من الساعى ثم قالوا فما تأمرونا قال كونوا احلاس بيوتكم .

খ- 'উক্ত রাবী থেকে অন্য বর্ণনায় আছে যে, তিনি خير من الساعى পর্যন্ত বলেন। অতঃপর লোকেরা জিজ্ঞেস করে ঃ আমাদেরকে আপনি কি হুকুম দেন? তিনি বললেন ঃ তোমরা নিজ নিজ গৃহে আঠার মতো লেগে থাকবে।'

(ج) وفى رواية الترمذى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى الفتنة كسروا فيها قسيكم وقطعوا فيها أوتاركم والزموا فيها أجواف بيوتكم وكونوا كابن آدم وقال هذا حديث صحيح غريب .

(গ)- তিরমিযী'র বর্ণনায় আছে যে, 'মহানবী (স) সে ফিতনা সম্পর্কে বলেছেন যে, তাতে তোমরা নিজেদের তীর-ধনুক-কামান ভেঙ্গে ফেলবে, তোমাদের তাঁত কেটে ফেলবে এবং গৃহের অভ্যন্তরে বসে থাকবে এবং আদমের পুত্রের মতো হয়ে যাবে।' ইমাম তিরমিযী বলেন যে, বর্ণনাটি সহীহ- গরীব।

এসব হাদীস নিয়ে গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করলে প্রসিদ্ধ সাধারণ ধারনা থেকে ভিন্ন কিছু বক্তব্য ফুটে ওঠে। হাদীসের এই শব্দগুলো

(١) القاعد فيهاخير من القائم والقائم فيها خير من الماشى والماشى فيها خير من الساعى .

(٢) فمن كان له ابل فليلحق بإبله ومن كان له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه .

(٣) كونوا احلاس بيوتكم .

(٤) والزموا فيها اجواف بيوتكم .

মূলত এদিকে ইঙ্গিত করে যে, এমন কিছু ফিতনা দেখা দেবে, যাতে যোগ দেয়া দীন ও ঈমানের ধ্বংসের সমান হবে। সেসব ফিতনা মানুষকে নিজের দিকে টেনে আনার জন্য বেশ শক্তি ব্যয় করবে, লোভ লালসা দেখাবে, চাপ সৃষ্টি করবে, বাধ্য করবে। কিন্তু সেসব লোভ-লালসায় পড়বে না, বাধ্য-বাধকতা অতিক্রম করে অল্পে তুষ্ট থাকবে, সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে অতি সামান্য আমদানীতে তুষ্ট থাকা দীন ও আখিরাতের জন্য উত্তম হবে। এ অর্থ এ ভাবে বুঝে আসে যে, মনে হয়- এই ফিতনা শুয়ে থাকা ব্যক্তিদেরকে জাগ্রত হবার জন্য, জাগ্রত ব্যক্তিদেরকে উঠে বসার জন্য, বসে থাকা ব্যক্তিদেরকে দাঁড়ানোর জন্য, দাঁড়ানো ব্যক্তিদেরকে চলার জন্য আর চলন্ত ব্যক্তিদেরকে দৌড়ানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করবে, লোভ দেখাবে বা বাধ্য করবে। যারা এরকম করবেনা, তারা দুনিয়ার জীবনে এবং আরাম আয়েশের ক্ষেত্রে পেছনে পড়ে থাকবে। তাদের জন্য দুনিয়া সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণ হয়ে পড়বে। যেখানে এক দিকে তুচ্ছ ও নিঃস্ব ব্যক্তিরা এই ফিতনার কোলে আশ্রয় নিয়ে দালান কোঠা, বাংলো -বালাখানা, উন্নত আরাম-আয়েশ

এবং অর্থ-বিত্ত নিয়ে খেলছে। সেখানে এই ফিতনায় যোগদান না করা অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরাও কিছু দিনের মধ্যে নিঃস্ব ও দুঃস্থ হয়ে পড়বে। পরিবেশ তাদের নিকট দাবী করবে যে, এটাই হচ্ছে উন্নতির পথ। কিছু লোক নানা ব্যাখ্যা করে হারামকে হালাল করবে আর হালাল রিজিক অন্বেষণকারীদের জন্য জীবন সংকীর্ণ হয়ে পড়বে। এমন পরিস্থিতিতে মহানবী (স) বলছেন যে, তোমাদের জন্য উত্তম হচ্ছে এই ফিতনাকে সঙ্গ না দেওয়া। আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছু দান করেছেন, তাতেই তুষ্ট থাকবে; কিন্তু দীনের ব্যাপারে দুর্বলতা দেখাবে না, আপোষ করবে না। যদি অতি কষ্টে খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব না হয়, তবুও আপোষ করবেনা। যে ব্যক্তি পেছনে পড়ে থাকবে, দীনের বিবেচনায় সে হবে অগ্রবর্তী। আর এই ফিতনার পিছনে যে ছুটে চলবে, দীনের ব্যাপারে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। এসব হাদীসে যেখানে যুদ্ধাস্ত্র ভেঙ্গে ফেলার কথা বলা হয়েছে, খুব সম্ভব তা বলা হয়েছে সেসব লোকের সম্পর্কে, যাদের পেশা সামরিক চাকুরি। কারণ, প্রশ্নের এই অংশ সেদিকেই ইঙ্গিত করছে -

فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولاغنم ولا أرض ، قال يعمد الى سيفه .

'ইয়া রাসূলুল্লাহ! যার উষ্ট্র নেই, মেষ নেই, ভূমি নেই, তার সম্পর্কে আপনার কি মত? তিনি বললেন ঃ এমন লোক তার তরবারির পানে ছুটে যাবে .... ।'

(২) কিন্তু যে হাদীসে বলা হয়েছে -

يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن .

এটা অতীব নাজুক পরিস্থিতি মনে হয়। সম্ভবত আবূ দাউদের অপর একটি বর্ণনায় এ দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে ঃ

انه قال ان بين يدى الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسى كافرا ويمسى كافرا ويمسى مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والماشى فيها خير

من الساعي فكسروا فيها قسيكم وقطعوا فيها أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة .

খুব সম্ভব এখানে সে পরিস্থিতির চিত্র অংকন করা হয়েছে যখন মু'মিন হবে বিশ্বের সবচেয়ে অসহায় এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাদেরকে শতকরা একশ ভাগ Marginalise তথা কোন্ ঠাসা করা হবে। জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করার অর্থ এই নয় যে, তাদের জীবন হবে নিঃস্ব ও দুঃস্থের জীবন। বরং এর অর্থ হচ্ছে- তাদের সামনে থাকবে জীবন-মরণ সমস্যা। তখন তৎকালীন বিজয়ী ব্যবস্থা এটাও বরদাশ্‌ত করার জন্য প্রস্তুত থাকবে না যে, কোন মু'মিন বান্দাহ্ যদি তার সবকিছু কুরবান করে কেবল মু'মিন হিসাবে বেঁচে থাকতে চায় তবে তাকে সে অনুমতি দেয়া যেতে পারে। জীবনের কাজ-কর্ম সবকিছু থেকে বেদখল করার পর আপন গৃহে জীবন্ত মু'মিন হিসাবেও তাকে বরদাশ্‌ত করা হবেনা। বরং তাকে বাধ্য করা হবে- হয় সে ঈমান ত্যাগ করবে, অথবা তাকে মানব সমাজ ছাড়তে হবে। এমন পরিস্থিতিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ একজন মু'মিনের অপরিহার্য কর্তব্য হবে দীন ঈমান নিয়ে পলায়ন করা। যার উষ্ট্রী থাকবে, সে উষ্ট্রী নিয়ে যাবে, যার মেষ-বকরী থাকবে, সে মেষ-বকরী নিয়ে পর্বত গুহায় আর ময়দান উপত্যকায় গিয়ে আত্মগোপন করবে, যাতে অন্ততপক্ষে মু'মিন হিসাবে বেঁচে থাকতে পারে।

হাদীসের কোন কোন ভাষ্যে এই কথাগুলো থেকে জটিলতা সৃষ্টি হয়। এ কারণে যে বিষয়টা সম্মুখে আসে, তা এই যে, এসব হাদীসে দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বে যেসব ফিতনা দেখা দেবে, তা মুকাবিলা করার উপায় বলে দেয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষ কিভাবে জীবন যাপন করবে, এ হাদীসের সম্পর্ক তার সঙ্গে। প্রথম রকমের হাদীসের সম্পর্ক ফিতনার প্রথমাংশের সঙ্গে আর দ্বিতীয়াংশের হাদীসগুলোর সম্পর্ক শেষাংশের সঙ্গে।

আমার ক্ষুদ্র মতে ১৯২৪ এবং বিশেষভাবে ১৯৩০ সালের পর এই প্রথমাংশের সূচনা হয়েছে, যখন সুদী কারবার বন্যার মতো জীবনের সকল ক্ষেত্রকে প্লাবিত করে দেয়। খিলাফাতের অবসানের পর ১৯৩০ সালে এমনটি করা হয়, যখন Gold Standard এর সমাপ্তি ঘটানো হয়। পরিতাপের বিষয়, উম্মতে মুসলিমার দণ্ডমুণ্ডের মালিক, সরকার আর ব্যক্তিবর্গ নিজেদের জিহাদ আর অর্থনৈতিক অগ্রাধিকার আর সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এ সব হিদায়াতের সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাদের কর্তব্য ছিল খিলাফাতের স্থলাভিষিক্ততা অর্জন করার চেষ্টা করা এবং সে ব্যবস্থার অধীনে নিজেদের সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার আর সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা অর্থাৎ ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে عفو তথা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সমস্ত আয় আর সম্পদ উম্মতের সামরিক প্রস্তুতিতে ব্যয় করা উচিত ছিল। কিন্তু এমনটি করা হয়নি। সামরিক প্রস্তুতির দিক থেকে উম্মত ক্রমেই পশ্চাৎপদ হতে থাকে। আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শয়তানী ব্যবস্থার সর্বোচ্চ প্রসার ঘটে। সুতরাং আজ যদি মুসলিম উম্মাহকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয় অর্থাৎ -

(১) সরকারী এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়

(২) বাণিজ্যিক বা Croporate পর্যায়

(৩) ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কৃষক বা চাকুরীজীবী শ্রেণী

তবে এগুলোর প্রথম দু'টি পর্যায় পুরোপুরি শয়তানী ব্যবস্থার অংশে পরিণত হয়েছে এবং হারামের উপরই তা স্থাপিত হয়েছে। বাকী থাকে তৃতীয় পর্যায়। সে ক্ষেত্রেও প্রান্তিক পর্যায়ে হয়তো কেউই হারাম থেকে মুক্ত নয়। অন্য বিবেচনায় বড়জোর শতকরা ১০ জন মুসলমান হালাল রিযিক ভক্ষণ করছেন।

আমাদের সমাজে বাতিল যেহেতু এখনো এই শর্ত আরোপ করেনি যে, কোন মু'মিনের বেঁচে থাকার অধিকার নেই; এ কারণে মুসলিম সমাজের শতকরা ৯০ ভাগ বাতিল ব্যবস্থার অংশ হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে মু'মিন

বলা এবং শুমার করা হয়। কিন্তু যেদিন সেই বিশ্ব শয়তানী ব্যবস্থা জোরপূর্বক এই হুকুম জারী করবে যে, ইসলামী বিধান অনুযায়ী যে জীবন যাপন করবে, সে হবে সন্ত্রাসী, সেদিন প্রবল আশংকা এই যে, শকতরা ৯০ জন সেই শিবিরে যোগ দেবে, হাদীস শরীফে যাকে فسطاط نفاق তথা 'মুনাফিকীর শিবির' বলা হয়েছে। সেখানে ঈমান পাওয়া যাবেনা। বাকী শতকরা ১০ ভাগ জনসংখ্যা ঈমানের শিবিরে শামিল হয়ে গুহায় আর পর্বতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে।

আলোচনার সারকথা এই যে, মূলত এসব হাদীস জিহাদ থেকে নিবৃত্তকারী নয়, বরং সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হিদায়ত দানকারী। কুরআন মজিদ এবং হাদীস শরীফ আমাদেরকে এ সিদ্ধান্তে পৌছায় যে, আমাদের নিকট এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই যে, আমাদেরকে দীন আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে, যে কোন মূল্য দিয়ে দীনের হিফাযত করতে হবে এবং আমাদের গোটা জীবন জিহাদের জন্য উৎসর্গ করতে হবে এবং সেই দলে নিজেদেরকে শুমার করাবো, যে দল সম্পর্কে মহানবী (স) বলেছেন ঃ

لاتزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناولهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال .

অর্থাৎ 'আমার উম্মতের একটি দল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে জিহাদ করতেই থাকবে। যারা তাদের সঙ্গে দুশমনী করবে তাদের উপর এ দলটি বিজয়ী হবে। এমন কি মসীহ্ দাজ্জালের বিরুদ্ধে যারা জিহাদ করবে, এরা হবে সেই সর্বশেষ দল।'

এখানে একটা প্রশ্ন দাঁড়ায়, এ কাজটি ঠিক সেভাবে কিরূপে সম্পন্ন হবে, যে ভাবে সম্পন্ন হওয়া আল্লাহ এবং আল্লাহ্র রাসূল চান?

কুরআন ও হাদীসের সমস্ত স্পষ্ট বর্ণনা এদিকে ইঙ্গিত করে- যে ফিতনা সম্পর্কে প্রত্যেক নবী নিজ নিজ উম্মতকে সতর্ক করেছেন, তা হলো এই বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফিতনা। যে ফিতনার মূলোৎপাটনের জন্য শেষ পর্যন্ত হযরত মসীহ্ আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন, সে ফিতনা কত ভয়ংকর হতে পারে! এখন দেখতে হবে যে, সে ফিতনার সঙ্গে লড়াই করার জন্য কুরআন হাদীসে কি কি হিদায়াত পাওয়া যায়।

কুরআন-হাদীস তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়ালে প্রথম যে বিষয়টা সামনে আসে, তা হচ্ছে এইঃ মু'মিনরা দৃঢ়পদ থেকে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে নিজেদের পদ-মর্যাদার দায়িত্ব পালন করে যাবে। কারণ তাদের এই দৃঢ়তার উপরই নির্ভর করছে গোটা মানবতার সফলতা। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা এই যে, তিনি মু'মিনদের জন্য শেষ পর্যন্ত হযরত মাহদী এবং হযরত ঈসা (আ) কে প্রেরণ করবেন। এ বিষয়টাও ইঙ্গিত করে যে, মু'মিনরা দৃঢ় থাকবে, এরই মধ্যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে। তারা নিজেরদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সে ভাবে পালন করবে, যে ভাবে পালন করলে তার হক আদায় হয়। এ হক আদায় করতে গিয়ে যদি কোটি কোটি মুসলমান মারা যায়, কেবল গুটি কতক বেঁচে থাকে, তবুও আল্লাহ তাদেরকেই বিজয়ী করবেন, সফল করবেন। দাজ্জাল, গোটা ইহুদীবাদ এবং মানব শয়তান ও জিন শয়তানের গোটা বাহিনীকে তিনি ধ্বংস করবেন। ইনশাআল্লাহ এরকমই হবে। কারণ আল্লাহ যা চান, তাই করেন।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি সম্মুখে আসে, তা এই যে, এই সত্যের সাক্ষ্যের জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (স) ব্যাপক হিদায়াত দান করেছেন। যাকে এমন এক মডেলের আকারে উপস্থাপন করা যায় যার তিনটি অংশ রয়েছে ঃ

(১) ঈমান

(২) জিহাদ

(৩) মা'আশ তথা অর্থ

ঈমানের অর্থঃ এই ফিতনার সম্মুখে সে ব্যক্তিই টিকে থাকতে পারে, যে ব্যক্তি ঈমানে দৃঢ়। আর ঈমানে দৃঢ়তা আসবে তাওহীদে পরিপক্কতা থেকে। আর তাওহীদে পরিপক্কতা আসবে আসমাউল হুসনায় পরিপক্কতা থেকে। যে ব্যক্তি ঈমানের দিক দিয়ে পূর্ণ তাওহীদবাদী হয়ে গড়ে ওঠেনি, সে এই ফিতনার সামনে টিকে থাকতে পারবেনা।

জিহাদের অর্থ ঃ সে তাওহীদের জন্য নিজের জীবনকে শতকরা একশভাগ জিহাদে নিয়োজিত করবে। এই ফিতনা এমন হবে যে, তাতে তাওহীদের হিফাযতই জিহাদ সাব্যস্ত হবে। আর এ ক্ষেত্রে প্রথম জিহাদ হবে আল্লাহ্র দিকে হিজরত করা। এই হিজরত শুরু হবে কুরআন মজীদের

নির্দেশ- والرجز فاهجر তথা পংকিলতা থেকে হিজ্‌রত কর এবং قال লূত বললেন- আমি আমার রবের দিকে হিজরত করছি إني مهاجر إلى ربي থেকে শুরু করে এমন এক স্থানে আসবে, যেখানে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰنِيْ رَبِّىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ج دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا ج وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ - قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - لَاشَرِيْكَ لَهٗ ج وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ -

'বল, আমার রব আমাকে সিরাতে মুস্তাকীমের দিকে হিদায়ত করেছেন। এমন ইবরাহীমের মিল্লাত, যা 'দীনে হানীফ' এর উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নন। বল, নিঃসন্দেহে আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের জন্য, যার কোন শরীক নেই, আমাকে এ নির্দেশই দেয়া হয়েছে এবং আমি প্রথম মুসলিম।' (আনআম ঃ ১৬১-১৬৩)

এই হিজরত তাকে মু'মিন হিসাবে বাঁচিয়ে রাখবে। যে ব্যক্তি হিজরত করবেনা, সে দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বেই সেই শয়তানী ব্যবস্থার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। যেমন পানির সঙ্গে লবণ মিশে একাকার হয়ে যায়। যখন দাজ্জাল আগমন করবে, তখনই তারা মাসীহকে দেখতে পাবে। যে ব্যক্তি হিজরত করবে, সে কেবল দৃঢ়পদই থাকবেনা, বরং সে-ই দাজ্জালকে চিনতে পারবে। দাজ্জালের মুকাবিলা করাও তাদেরই ভাগ্যে জুটবে। এরাই হবে সেই দল, যাদের জন্য আল্লাহ্‌র নবী সু-সংবাদ দিয়ে বলেছেনঃ

احرزهما الله من النار 'এরা হবে সেই দুই দলের অন্যতম, আল্লাহ্ যাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন।'

মা'আশ তথা অর্থ মানে ঃ যে ব্যক্তি অর্থের ফিতনায় পতিত হবে, সে ধ্বংস হবে। দাজ্জালের ফিতনা অর্থের ফিতনা। যে ব্যক্তি অধিক সম্পদের আকাংখী হবে, সে হারামে জড়িয়ে অর্থের ফিতনায় পতিত হবে। যে ব্যক্তি অর্থের ফিতনায় জড়িয়ে পড়বে, সে তাওহীদ হিজরত এবং জিহাদ থেকে

মুখ ফিরাবে এবং সে দাজ্জালের অংশে পরিণত হবে।

لكل أمة فتنة وان فتنة أمتى المال . (مسند أحمد)

'প্রত্যেক উম্মতের জন্য ফিতনা রয়েছে আর আমার উম্মতের ফিতনা হলো সম্পদ।' (মুসনাদে আহমদ)

এই উম্মত এবং দাজ্জালের ফিতনা প্রসঙ্গে মহানবী (স) এর সবচেয়ে বেশী যে চিন্তা ছিল, তা ছিল এ জন্য যে, তাঁর আশাংকা ছিল- উম্মতের বিপুল সংখ্যক লোক এতে জড়িয়ে পড়ে দাজ্জালের সহজ গ্রাসে পরিণত হবে। মহানবী (স) বলেন ঃ

عن عقبة بن عامر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى قتلى أحد ، فصلى عليهم بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والاموات ثم طلع الى المنبر فقال : إنى بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم ، وان موعدكم الحوض ، وانى لانظر اليه من مقامى هذا ، الا وانى لست اخشى عليكم ان تشركوا ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها ، قال : فكانت آخر نظرتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . (متفق عليه)

'ওকবা ইবনে আমের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) ওহোদ যুদ্ধের শহীদদের কবরের দিকে গমন করেন এবং আট বছর পর তাদের জন্য নামায পড়েন। যেন তিনি জীবিত এবং মৃতদের থেকে বিদায় নিচ্ছেন। অতঃপর তিনি মিম্বরে আরোহন করে বলেন ঃ আমি তোমাদের আগে চলে যাচ্ছি এবং আমি হবো তোমাদের জন্য সাক্ষী। হাউজে কাওসারে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাত হবে। আমি যেন এখান থেকে তা দেখতে পাচ্ছি। সাবধান, শির্কের ব্যাপারে নয়, বরং দুনিয়ার ব্যাপারে তোমাদের জন্য আমার আশংকা। আমার ভয় হচ্ছে, তোমরা যেন দুনিয়ার প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত না হও। বর্ণনাকারী বলেন, সেখানে আমি তাঁকে শেষ বার দেখেছি।' (বুখারী, মুসলিম)

মহানবী (স) যে মডেল দেখিয়েছেন, তাতে এ তিনটি মূলনীতি পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে মুবীনে এই গোটা সংঘাতকে একটা উদাহরণ দ্বারা বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এই হিদায়াতও দিয়েছেন যে, মু'মিনদেরকে কিয়ামতের পূর্বে এই ফিতনার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কোন্ পন্থা অবলম্বন করতে হবে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ج فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ج فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ط فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ط قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ط وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ - وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ- فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ط وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ .

'অতঃপর তালূত যখন সৈন্য বাহিনীসহ বের হলো তখন সে বললো-আল্লাহ এক নদী দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করবেন। যে কেউ তা থেকে পান করবে, সে আমার দলভুক্ত নয়; আর যে কেউ তার স্বাদ গ্রহণ করবেনা, সে আমার দলভুক্ত, তবে যে কেউ এক কোষ পানি গ্রহণ করবে, সে বাদে। অতঃপর অল্প সংখ্যক ব্যতীত সবাই পানি পান করলো। তারপর যখন তালূত ও তার সাথী মুমিনগণ নদী পার হলো, তখন তারা বললো, জালূত এবং তার সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতা আমাদের আজ নেই। কিন্তু যাদের প্রত্যয় ছিল আল্লাহর সঙ্গে তাদের সাক্ষাত ঘটবে তারা বললো, আল্লাহ্র হুকুমে

কত ক্ষুদ্র দল বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। তারা যখন যুদ্ধার্থে জালুত ও তার সৈন্যদের সম্মুখীন হলো, তখন বললো, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে ধৈর্য দান কর, আমাদের পদ অবিচলিত রাখ এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। অবশেষে তারা আল্লাহর হুকুমে ওদেরকে পরাভূত করলো। দাউদ জালুতকে বধ করলো। আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব ও হিকমত দান করলেন এবং তাকে যা ইচ্ছা শিক্ষা দিলেন। আল্লাহ্ যদি মানব জাতির এক দলের দ্বারা অন্য দলকে প্রতিহত না করতেন, তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেতো। কিন্তু আল্লাহ্ জগত সমূহের প্রতি অনুগ্রহশীল। এগুলো আল্লাহ্র আয়াত। আমি তোমার নিকট তা যথাযথভাবে তিলাওয়াত করছি, আর নিশ্চিত তুমি রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত।' (বাকারা ঃ ১৪৯-১৫২)

এই একই কথা আল্লাহ্র রাসূল বলেছেন এভাবে ঃ

ان الدجال يخرج وان معه ماء ونارا ، فأما الذى يراه الناس ماء فنار تحرق وأما الذى يراه الناس نارا فماء بارد عذب فمن ادركه منكم فليقع فى الذى يراه نارا فانه ماء عذب طيب .

'নিঃসন্দেহে দাজ্জাল বের হবে এবং তার সঙ্গে পানি আর আগুন থাকবে। অবশ্য মানুষ যাকে পানি দেখবে, তাতো হবে আগুন, যা জ্বালিয়ে ফেলবে। আর যাকে মানুষ আগুন দেখবে, তাতো হবে সুমিষ্ট শীতল পানি। তোমাদের মধ্যে যে তাকে পায়, সে যেন তাতে পতিত হয়, যাকে আগুন দেখতে পায়। কারণ তাতো সুমিষ্ট পবিত্র পানি।' (বুখারী, মুসলিম)

উপসংহার

মুসলিম বিশ্বের সকল ব্যক্তি আর সংগঠনের কর্তব্য হলো সমস্ত হারাম কর্ম থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকা। এ কারণে তাদের আয় আর মুনাফা হ্রাস পেলেও তাদেরকে এ কাজ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে একথাও বলে রাখি যে, ভ্রান্ত দেশ, ভ্রান্ত সরকার আর ভ্রান্ত বিধান থেকে তাদেরকে সম্পূর্ণ দূরে থাকতে হবে। তারা নিজেরা দারুল ইসলাম আর দারুল কুফরের পাঁচিল ধ্বংস করছে। এটা স্পষ্ট গোমরাহী ও ধ্বংস। এ ভাবে দারুল কুফর দারুল ইসলাম হতে পারেনি; অবশ্য দরুল ইসলাম দারুল কুফরের সঙ্গে মিশে গেছে।

অপর দিকে ইসলামী দেশ, ইসলামী সমাজ এবং ইসলামী ব্যক্তিদেরকে নিজেদের সমস্ত উপার্জনের ক্ষুদ্র অংশ নিজেদের প্রয়োজনে ব্যয় করতে হবে। অবশিষ্ট সমস্ত অংশ ব্যয় করতে হবে প্রতিরক্ষামূলক উৎপাদনের কাজে। এতে এ বিষয়টাও অন্তর্ভুক্ত যে, প্রতিরক্ষামূলক উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো ছাড়াও জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিভাগগুলোতে প্রয়োজনানুপাতে পুঁজি বিনিয়োগ করতে হবে। এ ছাড়া Luxuries তথা বিলাস ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে। মুসলিম বিশ্বের সমাজকে সম্পূর্ণরূপে মুহাজির সমাজে পরিণত হতে হবে। অর্থাৎ মুহাজিরদের এমন একটা সমাজ, যা কেবল জিহাদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। এই মডেল পুরাপুরি বাস্তবয়নই আগামী দিনের ফিতনা মুকাবিলায় মুসলিম মিল্লাতকে অটল-অবিচল রাখতে পারে। নেতা ও সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মুসলমানের সমান ভাবে এই দায়িত্ব।

এমন একটা চ্যালেঞ্জের দাবী হচ্ছে উম্মতকে সত্যিকার অর্থে উম্মতে পরিবর্তিত হতে হবে। নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা তথা New world order কার্যকর করার পর যেসব মুসলমান দেশ বা সমাজে বসবাসকারী মুসলিম Nation State জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা নিয়ে বেঁচে আছে তাদের উদাহরণ দরজা বন্ধ করে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমানো সেই ব্যক্তির মতো, যে এ ধারণা করে ঘুমাচ্ছে যে, এখনো অনেক রাত। ভোর হতে আরো অনেক দেরী। অথচ কক্ষের বাইরে সূর্য উদিত হয়েছে বেশ কয়েক ঘন্টা আগে। এটা খুবই

মর্মান্তিক ব্যাপার, যে জাতির কর্তব্য হচ্ছে এ বাস্তবতা নিয়ে জীবন যাপন করা যে, তারা হচ্ছে একটা বিশ্ব ব্যবস্থার অংশ এবং তাদের জাতীয় জীবনে কোন রকমের ভৌগলিক সংকীর্ণতাবোধ শরীয়ত মতে হারাম, তারা জীবনের ৯৯ ভাগ অংশে ভৌগলিকভাবে বিভক্ত হয়ে জীবন যাপনে তুষ্ট- কি সরকারী আর বেসরকারী ব্যক্তি আর প্রতিষ্ঠান, সর্বত্র একই অবস্থা। আর যে ভ্রান্ত জাতির জন্য কেবল এতটুকু অনুমতি ছিল যে, আল্লাহ্‌র জমীনে জিযিয়া দান করে নত হয়েই কেবল সে বসবাস করতে পারে, অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে; আজ তারা শতকরা একশ ভাগ Globalised হয়ে জীবন যাপন করছে। আসল সত্য কথা এই যে, এমন সরকারী সংস্থা অর্থাৎ সমস্ত ইসলামী দেশ এবং বেসরকারী সংস্থা অর্থাৎ ইসলামী আন্দোলন এবং ব্যক্তিবর্গ, যারা Nation state এর স্তরে অবস্থান করছে, তারা কার্যত হারাম জীবন যাপন করছে। আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যারা কোন সনদ লাভ করেনি।

তাই বিশ্বের সমস্ত মুসলিম সরকারী-বেসরকারী সংস্থার সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান কর্তব্য হচ্ছে অবিলম্বে বর্তমান অবস্থা থেকে হিজরত করা। একটা উম্মাহ তথা বিশ্বজোড়া জাতি হিসাবে বিশ্ব পর্যায়ে সংগঠিত হওয়া তাদের জন্য ফরয। কেবল এমন করেই তারা আসন্ন বিপদের মুকাবিলা করতে সক্ষম হবে, যে বিপদ তাদের দরজায় করাঘাত করছে এবং যে কোন সময় ধ্বংস ডেকে আনতে পারে।

اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا کبھی

دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا

'উঠো, না হলে আর কখনো হাশর হবে না

ছুটে যাও-দৌড়াও, যমানাতো কিয়ামতের চাল শুরু করেছে।'

আজ থেকে ১৫শ বছর পূর্বে সাফা পর্বত থেকে আল্লাহ্‌র শেষ নবী (স) যে সৈন্য বাহিনীর হামলার সংবাদ দান করেছিলেন, সে বাহিনী অবিলম্বে বেরিয়ে আসবে!

পরিশিষ্ট- ১

উপসাগরীয় যুদ্ধ ঃ গোপন রহস্য, শেষ পরিণতি

বাহ্যত উপসাগরীয় যুদ্ধ শেষ হয়েছে। জাতিসংঘ, আমেরিকা এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশ তর্কাতীত ভাবে জয়ী হয়েছে। কুয়েতে শেখ জাবের আল-সাবাহ'র ক্ষমতা বহাল হয়েছে এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ এর উক্তি অনুযায়ী আইনের শাসনের Rule of law-এর বিজয় হয়েছে। কিন্তু এই বাস্তবতা সম্পর্কে কোন ওয়াকেহাল ব্যক্তি হয়তো দ্বিমত পোষণ করতে পারবেনা যে, সমস্যার মূল সূত্র, যার কারণে ইরাক কুয়েতের মতো একটা প্রতিবেশী দেশে সৈন্য চালনা করেছে এবং এই ঘটনার পরিণতিতে যেসব সম্ভাবনা আর শংকা দেখা দিতে পারতো, পাশ্চাত্য দেশগুলো জাতিসংঘের আশ্রয় নিয়ে সেসবের পথ রোধ করেছে, তা যথারীতি বর্তমান রয়েছে। তাই এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধ বাহ্যত বন্ধ হয়েছে বলেই ধরে নেয়া যেতে পারে। সুতরাং এই যুদ্ধের বাহ্যিক পরিনতি যাই দেখা যাকনা কেন, ওয়াকেফহাল মহলের মতে মূল আর অন্তর্ণিহিত তত্ত্ব-রহস্যের বিবেচনায় এই যুদ্ধ বড় যুদ্ধের সূচনাপর্ব মাত্র।

সমকালীন পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাস রচনা আর ঘটনা লিপিবদ্ধ করার মূলনীতি অনুযায়ী এই ঘটনার মূলভিত্তি সাব্যস্ত হয়েছে কুয়েতে ইরাকের সৈন্য চালনা এবং ইরাকের কুয়েত দখল। পাশ্চাত্যের ইতিহাস রচনায় কোন বিশেষ সন তারিখ বা ঘটনা নির্ণয় করা মূল সমস্যা উম্মোচন বা ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে সমস্যার সে ব্যাখ্যাকে চিহ্নিত করা হয়, যা পাশ্চাত্যের মনোবাসনার অবিকল অনুকূল। আর এই চেষ্টা এজন্যই করা হয় যাতে গোটা দুনিয়া তাদের ব্যাখ্যাকে মূল সমস্যার প্রকৃত বিবরণ বলে স্বীকার করে নেয়। অবশ্য পাশ্চাত্যের ইতিহাস রচনার এমন ধারা ঐতিহাসিকদের নিকট সব সময় বিতর্কিত ছিল; চাই তা প্রাচীন কাল, মধ্য যুগ বা আধুনিক যুগের ব্যাখ্যা হোক, বা ইউরোপের ইতিহাস নেপোলিয়ানের যুগ থেকে শুরু করা হোক।

কুয়েতে জবর দখলের পাশ্চাত্য ব্যাখ্যাকে উপসাগরীয় যুদ্ধের সূচনা বিন্দু স্বীকার করে নিলে কতিপয় বিষয় বৈধ সাব্যস্ত হয়, যা পাশ্চাত্যের মর্জির অবিকল অনুকূল।

১. ইরাকের বিরুদ্ধে দুনিয়ার তাবৎ উপকরণের সমাবেশ।

২. ইরাকের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অবরোধ।

৩. ইরাকের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা এবং কুয়েত থেকে ইরাকের বিতাড়ন।

৪. ইরাকের শক্তি ধ্বংস এবং ভবিষ্যতে তা সীমিত করণ।

এতদসঙ্গে এই ব্যাখ্যা স্বীকার করে নেয়ার অপরিহার্য পরিণতি দাঁড়াবে এমন কিছু বিষয়, যা গোপন রাখা অবিকল পাশ্চাত্যের খাহেশ, কিন্তু ঐতিহাসিক যাকে মূল সমস্যার বুনিয়াদ সাব্যস্ত করে- সে সব বিষয় বিস্মৃতির শিকায় উঠবে। সাধারণ মানুষের কাছে কুয়েতের মতো ক্ষুদ্র দেশের উপর ইরাকের সৈন্য চালনা গুরুত্ব লাভ করবে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের নিকট এর কোন গুরুত্ব নেই। কারণ এই সৈন্য চালনার সমুদয় বিষয় নির্ভর করে একটা দেশের শীর্ষ নেতার ইচ্ছার (Intent) উপর যা আগাগোড়া সাময়িক এবং অস্থায়ী উপাদান। গুরুত্ব হচ্ছে সেই উপাদানের যা স্থায়ী ও স্থিতিশীল এবং যার শক্তির (Potential) ভিত্তি আছে। এখন যেখানে ইরাকের সৈন্য সমাবেশের পেছনে রয়েছে সাময়িক ও অস্থায়ী ইচ্ছা (Intent), সেখানে নিক্সন পরিকল্পনা, ওয়েনবার্গ পরিকল্পনা, আমেরিকা থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত সরল রেখায় (Beeline) যুদ্ধের মেশিনারী স্থাপন এবং সেসব বিষয় যার সম্পর্ক না আছে স্বল্প কালীন পরিকল্পনার সঙ্গে, আর না আছে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার সঙ্গে, বরং যার মধ্যে অধিকাংশ বিষয় নিরেট Perspective Planning এর সঙ্গে সম্পৃক্ত, এ সব আগাগোড়া দীর্ঘস্থায়ী ও স্থিতিশীল।

বাস্তব পরিস্থিতি

(রচনাকাল- ১ এপ্রিল ১৯৯১)

কোন বিরোধের ক্ষেত্রে তার বাস্তবতা নির্ণয় করে উভয় পক্ষের বাহ্যিক পরিস্থিতির পরিবর্তে বাস্তব অবস্থা, বাস্তব অবস্থার সম্পর্ক মূল সমস্যার বিচারে তার হেতু বা কৈফিয়ত বর্ণনার (Orientation of Potential) সঙ্গে, উভয় পক্ষের মধ্যে মূল হামলাকারী সে পক্ষ, যার ইচ্ছা, অভিপ্রায়ের পশ্চাতে রয়েছে প্রয়োজনীয় শক্তির (Required Potential) Orientation বিন্যাস। আমেরিকা থেকে লক্ষ লক্ষ সৈন্য এবং কোটি কোটি টন অস্ত্রশস্ত্র একযোগে মধ্যপ্রাচ্যে স্থানান্তরের জন্য সরল রেখায়

(Beeline) যুদ্ধোপকরণের প্রস্তুতি, আটলান্টিক মহাসাগর, ভূমধ্যসাগর এবং মধ্যপ্রাচ্যে বিশালকায় স্থাপনা নির্মাণ এবং সুযোগ-সুবিধার প্রস্তুতি কমপক্ষে ২০ বছর ব্যাপী পরিকল্পনার ফল আর এ সমস্ত প্রচেষ্টার বাস্তব প্রমাণ এই যে, কুয়েতে ইরাকের সৈন্য চালনার অন্তত ২০ বছর পূর্ব থেকে এই প্রস্তুতি চলতে থাকে। এহেন পরিস্থিতিতে ইরাকের কার্যক্রমকে আগাগোড়া প্রতিরক্ষামূলক বলে অভিহিত করা যেতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্য জগত ও তাদের প্রচার মাধ্যম কুয়েতে ইরাকী সৈন্য সমাবেশকে সাব্যস্ত বিরোধের সূচনা বিন্দু করার জন্য জিদ ধরেছে। কুয়েতে ইরাকের সৈন্য সমাবেশের কার্যকারণ আর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাদ দিয়েও ইরাকের শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে নীচের তথ্যগুলো প্রমাণিত হয়েছে ঃ

১. আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে ইরাকের প্রতিরক্ষামূলক এবং আক্রমণাত্মক হামলা করার ক্ষমতা আছে।

২. গোটা বিশ্ব বা কোন সুপারপাওয়ারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ইরাকের যুদ্ধোপকরণ মৌলিকভাবে প্রস্তুত করা হয়নি।

৩. আপন অগ্রাধিকারের বিষয়ে ইরাকের প্রস্তুতির ধরন সেরকম ছিলনা, যেমন প্রস্তুতি ছিল ৩০ এর দশকে জার্মানীর।

সুতরাং এসব তথ্য থেকে যে সত্য উদ্ভাসিত হয়, তা এ রকম ঃ

১. কুয়েতের বিরুদ্ধে ইরাকের উপরোক্ত কার্যক্রম মূলত আঞ্চলিক পর্যায়ের। তবে তা নিরেট শাস্তিমূলক বা প্রতিরক্ষামূলক হতে পারে।

২. যে পরিস্থিতিতে ইরাক ৫ আগষ্ট ১৯৯০ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ পর্যন্ত কার্যক্রম পরিচালিত করেছে, তাকে একটা সুপার পাওয়ারের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের মুকাবিলা বলা যেতে পারে, যাতে স্থির থাকা তার প্রতিরক্ষামূলক এবং নৈতিক দায়িত্ব ছিল।

৩. মূল সমস্যা ইরাকের কুয়েত দখল একথা ১৭ জানুয়ারী, তৎপরবর্তীকালে সংঘটিত ঘটনাবলী এবং মার্কিন অবস্থান কার্যত খন্ডন করে। এজন্য কুয়েতের উপর ইরাকের দখলদারিত্ব দূর করার সীমা কুয়েত থেকে ইরাকের বিতাড়ন পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু ইরাকের মৌলিক কাঠামো (Infrastructure) ধ্বংসের চেষ্টা করা, ইরাকী এলাকায় সৈন্য পরিচালনা এবং মধ্যপ্রাচ্যে শক্তির ভারসাম্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নয়া প্রতিরক্ষা

ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা একথার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, ইরাকের কুয়েত অধিকার করা মূল বিরোধের বিষয় ছিলনা।

ইরাক ও কুয়েত

ইরাকী আগ্রাসন এবং একটা মুসলিম দেশ হিসাবে ইরাকের কর্মক্ষমতা- এ দুটো পৃথক জিনিস। ইরাকী আগ্রাসন তার দণ্ডমুণ্ডের মালিকদের ইচ্ছা থেকে উদ্ভূত, যা আগাগোড়া একটা সাময়িক ফ্যাক্টর। আর ইরাকের কর্মক্ষমতার উৎস তথাকার জনগণের উপকরণ আর পুঁজি, যা সাময়িক নয় এবং যার স্থান হচ্ছে স্বতন্ত্র ফ্যাক্টরের। কোন অঙ্গের বক্রতা সংশোধনের কাজ বক্রতা দূর করা পর্যন্ত চলতে পারে। কিন্তু অঙ্গের সঞ্চালনকে স্থায়ীভাবে বেকার বা বিকল করা পর্যন্ত কিছুতেই চলতে পারেনা। কিন্তু বাস্তবে এটাই ঘটেছে। ইরাকী আগ্রাসন রোধ করার আড়ালে কার্যত এ চেষ্টাই চালানো হয়েছে, যাতে ইরাকের কর্মক্ষমতার অবসান ঘটনো যায়। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, কুয়েতে ইরাকী সৈন্য সমাবেশের ব্যাখ্যা ছিল একটা প্রতারণা মাত্র।

উপরোক্ত তথ্যাবলীর অকাট্য দাবী এই যে, উক্ত যুদ্ধের কার্যকারণ, অন্তর্নিহিত রহস্য আর ফলাফল সম্পর্কে ব্যাপক সমীক্ষা চালাতে হবে। কারণ, এ সব ভয়ংকর হামলার লক্ষ্য যদি কুয়েত থেকে ইরাকের বিতাড়ন না হয়ে অন্য কিছু হয়, তাহলে সেসব ভয়ংকর অভিযানের কাহিনী এখনো শেষ হয়নি, বরং অনাগত দিনগুলোর অভ্যন্তরে আরো অনেক ভয়ংকর দৃশ্য লুকিয়ে আছে, যে জন্য উম্মতকে মানসিক এবং বাস্তবিত উভয় দিক থেকে অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে।

ফিলিস্তীনের মূল বাসিন্দা ফিলিস্তীনীদেরকে তাদের আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত করে বিশাল-বিস্তীর্ণ ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং পার্শ্ববর্তী লেবানন ও অন্যান্য আরব দেশে হামলা চালিয়ে বিপুল অঞ্চলের উপর ইসরাইলের দখলদারিত্ব পাকাপোক্ত করা, নিজের আত্মরক্ষার নামে তাকে প্রতিরক্ষা ঘাটিতে পরিণত করা কোন অঞ্চলের জনগণ এবং দেশের নিরাপত্তা ও স্বায়ত্ব শাসনের স্পষ্ট লংঘন। কিন্তু এসব বিষয়ের মধ্যে কোন একটি জাতিসংঘ এবং পাশ্চাত্য দেশগুলোকে বুঝাতে পারেনি যে, বিশ্ব ঐক্য গড়ে তুলে ফিলিস্তীনীদের অধিকার পুর্নবহাল করা উচিত। এটা একথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, কোন দেশের সার্বভৌমত্ব লংঘন করা ইরাকের অপরাধ ছিলনা

এবং ইরাকের বিরুদ্ধে ফ্রন্ট গড়ে তোলার আসল বৈধতাও কুয়েতের সার্বভৌমত্ব লংঘন ছিলনা। বৃটেনের খ্যাতনামা সাময়িকী ইকোনমিষ্ট (Economist) ১২ জানুয়ারী ১৯৯১ এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে এ যুদ্ধের বৈধতা, তার মূল কারণ এবং অন্তর্নিহিত রহস্য সম্পর্কে সমীক্ষা চালিয়েছে। জটিল পরিভাষা আর বর্ণনা ভঙ্গি সত্ত্বেও এতে পাশ্চাত্যের মূল কারণের কিছুটা সঠিক ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। প্রাচ্যের যেসব বুদ্ধিজীবী গোটা কাহিনীর সূচনা বিন্দু কুয়েতে ইরাকী সৈন্য সমাবেশকে সাব্যস্ত করতে এখনো ক্লান্ত হয় না, তাদের জন্য উক্ত সম্পাদকীয় শিক্ষণীয় এবং প্রমাণ স্বরূপ।

সাময়িকীটিতে লিখা হয়েছে ঃ

"The Result of all wars is men killed, maimed or made insane by horror. This time the horrors may include ballistic missiles, chemical weapons, even ... if Iraq is foolish enough to lash out at Israel .... nuclear ones too. Can any cause be great enough to justify the slaughter?"

এর জবাব দিয়ে সাময়িকীটি লিখে ঃ

"The answer is yes. There is no good war, but sometimes a bad peace can be worse than itself. A peace that left Saddam Hussain unchallenged in kuwait would be trebly bad."

এ তিনটি বিষয় চিহ্নিত করে আরো লেখা হয়েছে,

"It would mean sacrificing a high principle: no country has the right to over-run and annes another. It would mean abandoning a great interest. Secure access to the oil of the Gulf, on which that prosperity of the whole world has come increasingly to depend. And, because of those two things, it would mean accepting a peace at all, merely that lull before a bigger explosion."

উপরোক্ত উদ্ধৃতি প্রাচ্য দেশগুলোতে ছড়ানো ব্যাখ্যা অর্থাৎ 'কুয়েতে ইরাকী জবর দখল' এবং 'কুয়েতের সার্বভৌমত্ব পুণর্বহাল' এর কেবল প্রতিবাদই করেনা। বরং এই যুদ্ধ এবং যুদ্ধকালে পরিচালিত ধ্বংস যুদ্ধের বৈধতার সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিত্তি স্থাপন করে। 'কুয়েতের উপর ইরাকের জবর দখল' একটি প্রতিবেশী ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের উপর নিছক হাত বাড়ানো এবং তার অধিকার হরণের প্রতি ইঙ্গিত করছে। অথচ উক্ত উদ্ধৃতি থেকে জানা যাচ্ছে যে, পাশ্চাত্য বিবেক নীচের তিনটি বিষয়ে একমত। এ ব্যাপারে তাদের কোনই সংশয়-সন্দেহ নেই।

১. ইরাকের এহেন কর্ম জাতীয়তাবাদের দর্শনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত। এটা সেই জাতীয়তাবাদের দর্শন, মধ্যযুগে ইসলামিক বিধানের (Islamic Order) অবসান শেষে গোটা মুসলিম জাহানে যে জাতীয়তাবাদী দর্শন প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং আধুনিক যুগে পশ্চিমা বিধানের সকল উন্নত সংস্থা যথা জাতিসংঘ, নিরাপত্তা পরিষদ, বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তাহবিল, ইওরোপীয় অর্থ বাজার, গ্যাট, বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিশ্ব ব্যবস্থা- এ সবই জাতীয়তাবাদী দর্শনের নিকট ঋণী।

২. ইরাকের এই কর্ম- কতিপয় বহিরাগত কার্যকারণ, যথা সারা বিশ্বে কর্মরত ইসলামী আন্দোলনের সৃষ্ট পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে পাশ্চাত্য বিধানের Infrastructure মৌলিক কাঠামোর উপর মারাত্মক আঘাত।

৩. এই দ্বিবিধ প্রচণ্ড আঘাতকে যথাসময়ে এবং কঠোরভাবে দমন করা না গেলে এমন এক বিস্ফোরণ অপরিহার্য হবে, যা গোটা পাশ্চাত্য ব্যবস্থাকে চিরতরে ধ্বংস করবে।

সুতরাং পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে ইরাকের এই কর্ম, যা সাদ্দাম হোসাইনের মতো পটভূমির অধিকারী ব্যক্তি সম্পন্ন করেছে এবং যা বাহ্যত ইসরাইল এবং এই ধরনের অন্যান্য দেশগুলির মতো নিজেদের প্রতিবেশীদের প্রতি হস্ত সম্প্রসারণ এবং তাদেরকে দখল করে নেয়াই হোকনা কেন। এটা ছিল সবচেয়ে পৃথক এবং পাশ্চাত্যের জন্য অতীব ভয়ংকর যা কোন অবস্থায়ই মেনে নেয়া সম্ভব নয়।

ইরাকের সৈন্য সমাবেশকে অন্যায় বলে স্বীকার করে নেয়া সত্ত্বেও উম্মত যদি নিজের সচেতনতা এবং দায়িত্বের প্রমাণ দিতো তাহলে এই কর্মের ফলশ্রুতিতে দেখা দেয়া ঘটনাপ্রবাহ এবং সে সবের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও

ফলাফল ইসলামের পক্ষে যতটা সহায়ক হতো, তা ধারণা করা কষ্টকর। ইতিহাসের দৃষ্টিতে এ ধরনের সৈন্য সমাবেশ কয়েক শতাব্দী পর বাস্তবে দেখা দিয়েছে। এমন দুঃসাহসিক কর্ম কয়েক মাসের নয়, বরং কয়েক শতাব্দীর ভাগ্য নির্ণয় করে।

পাশ্চাত্য ব্যবস্থা

মনে হয় পাশ্চাত্যের সমস্ত মস্তিস্কই এ ব্যাপারে একমত যে, ইরাকের সাফল্য কেবল একটা প্রতিবেশী দেশের উপর সৈন্য চালনার ব্যাপার ছিলনা, বরং মূলত তা ছিল পাশ্চাত্য ব্যবস্থার মৃত্যু ঘোষণা। আর ইরাকী শক্তির পতনসহ উন্নয়নশীল মুসলিম শক্তির অবনতি এবং এই কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে দেখা দেয়া ঘটনা প্রবাহকে কর্তন করা নিছক একটা দেশের সার্বভৌমত্ব বহাল করাই নয়, বরং পাশ্চাত্য ব্যবস্থাকে মৃত্যুর মুখ থেকে টেনে এনে তাকে নবজীবন দান করেছে। এমন কোন কাজের জন্য যে কোন কোরবানী এবং কিছুদূর পর্যন্ত গমন করা নিতান্তই যথার্থ হয়ে থাকে।

মধ্যখানে একটা কথা বলে রাখা যায় যে, মুসলিম বিশ্বে যেসব ঘটনা প্রবাহের উদ্ভব ঘটে, সে সবের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও ফলাফলের স্পষ্ট জ্ঞান প্রাচ্য এবং বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের কর্তাব্যক্তিদের তুলনায় প্রতীচ্যের কর্তা ব্যক্তিদের বেশী হয়ে থাকে। এটা এই শতাব্দীর নিকৃষ্টতম দুঃখজনক ঘটনা যে, মুসলিম বিশ্বের বেশীর ভাগ নেতাদের জ্ঞান-বুদ্ধির মোট পুজী এ সমস্যা সম্পর্কে তাদেরকে যেখানে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে, তা ছিল ঘটনার সেই ব্যাখ্যা যে ইরাক কুয়েতের সার্বভৌমত্বের উপর হামলা করেছে।

تف بر تو اے چرخ گردوں تف

'হে ঘূর্ণায়মান চক্র, ধিক তোমাকে ধিক!'

পাশ্চাত্যের দেশগুলো এ ঘটনাকে কোন্ প্রেক্ষাপটে দেখেছে এবং তার ফলাফল রোধে কিভাবে তারা সারিবদ্ধ হয়েছে- এ সম্পর্কে ধারনা করা যায় মার্কিন প্রেসিডেন্টর বিবৃতি থেকে, যাতে তিনি বলেছিলেন- আমেরিকা এবং তার মিত্ররা গোটা বিশ্বের সঙ্গে চূড়ান্ত যুদ্ধ (Final War) করছে। (দ্রষ্টব্য ঃ The Statesman, Calcutta Dated Feb. 1991) আমাদের জন্য অপরিহার্য হচ্ছে এ ঘটনাকে পাশ্চাত্য মস্তিক দিয়েও বুঝার চেষ্টা করা।

Sykes Picot Agreement অনুযায়ী ১৯৪৮ পর্যন্ত পরিপূর্ণ সফলতার

পর পাশ্চাত্যের বিন্দু মাত্রও সন্দেহ ছিলনা যে, মুসলিম বিশ্ব এখন আর নিরেট ইসলামী ঐতিহ্যের ভিত্তিতে কোন যুদ্ধ চালাবে যা পাশ্চাত্যের জন্য হুমকি হতে পারে। কখনো কখনো পাশ্চাত্যের আশংকা ছিল স্থানীয় বিস্ফোরণের (Local Explosions), যে জন্য তারা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করে রেখেছিল। মুসলিম বিশ্বের চিরস্থায়ী পংগুত্বের ব্যাপারে তাদের সামান্যতম সন্দেহ থাকলেও তারা কখনো ইসরাইলকে একথার অনুমতি দিতোনা, যাতে সে রাজনৈতিক প্রতীক সমূহ থেকে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে দীনী এবং ঈমানী প্রতীক সমূহের উপর আকণ্ঠ হস্ত সম্প্রসারিত করে সে সবকে ধ্বংস করার চেষ্টা করবে, যা করেছিল সে ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সালে। মসজিদে আকসা অধিকার করা এবং তা জ্বালিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চালানো সংবাদপত্র পাঠকদের জন্য কেবল দু'টি খবর হতে পারে; কিন্তু ইতিহাস আর ইতিহাসের দর্শন পর্যন্ত যাদের দৌড় আছে, তাদের জন্য এটা এমন দু'টি অস্বাভাবিক ঘটনা, যা শতশত বৎসর পর সংঘটিত হয় এবং শতশত বৎসরের পরিবর্তনের দিক নির্ণয় করে। এসব ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে যা কিছু দেখা দিয়েছে, তা পাশ্চাত্যকে নিজেদের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কিছুটা আশ্বস্ত করেছে।

১৯৭৩ সালে বাহ্যত তাদেরই শিবিরের এক বিশ্বস্ত ও অনুগত ব্যক্তিত্ব যখন তাদের উপর হানে প্রথম বারের মতো প্রচণ্ড আঘাত, তখন পাশ্চাত্যবাসী এই অবহেলার নিদ্রা থেকে হঠাৎ জেগে ওঠে। এ ঘটনা ছিল বাদশাহ ফয়সাল মরহুমের নেতৃত্বে ওপেক (Opec) কর্তৃক পাশ্চাত্যকে তেল সরবরাহ করতে অস্বীকৃতি। ১৯২৩ সালের পর এই প্রথমবার পাশ্চাত্য বুঝতে পারল যে, ইসলামী ঐতিহ্যের তেজ কেবল জীবন্তই নয়, বরং ক্রিয়াশীলও রয়েছে। পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে এটা মৃত্যু ঘন্টার চেয়ে কম ছিলনা।

এ ঘটনা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য ইসলামী মূল্যবোধকে ক্রিয়াশীল বলে স্বীকার করে নিতে এবং সত্যিকার বিপদ (Actual Danger) বলে মেনে নিতে ইতস্তত করছিল। এমন সময় দ্বিতীয় ঘটনা সংঘটিত হয়, অর্থাৎ ইরান বিপ্লব, যার ভিত শিয়া ফিকহের অদলে গড়ে উঠলেও মূলত তা ছিল ইসলামী মূল্যবোধের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এ ঘটনা পাশ্চাত্যের মন মানসের উপর পড়ে থাকা সমস্ত আবরণ অপসারণ করে দেয়। মুসলিম বিশ্ব যে

কোন বিধানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকুক আর যেকোন ধরনের শাসক- দ্বারাই পরিচালিত হোক না কেন-পাশ্চাত্য ব্যবস্থার জন্য তাকে সত্যিকার হুমকি বলে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।

কিন্তু মুসলিম বিশ্বে সৃষ্ট এই পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়া এবং তাকে সম্পূর্ণ বিনাশ করা এখন কতিপয় কারণে পাশ্চাত্যের জন্য অসম্ভব ছিল, যতক্ষণ সমকালীন বিধানের শক্তিশালী ব্যবস্থাপনার অধীনে বিশ্বের মানচিত্রে কতিপয় রাজনৈতিক, বস্তুগত, সাংস্কৃতিক এবং সামরিক পরিবর্তন সূচিত না হয়। এমন অস্বাভাবিক পরিবর্তন বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত সম্ভব ছিল; কিন্তু এখন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অবশ্য পাশ্চাত্য শক্তি তাদের সমস্ত শক্তি আর উপকরণ একত্র করে এজন্য চেষ্টা অবশ্যই করতে পারে।

পাশ্চাত্য জগত ইতিহাসের যে মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে,তাতে তার এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। সুতরাং সে সমস্ত খেলাঘর ভেঙ্গে দিয়ে একটা বাস্তব এবং সর্বাত্মক ঐক্যফ্রন্ট গঠনের কার্যক্রম শুরু করে, যাকে বলা হয় এক মেরু ব্যবস্থা। অবশ্য তৃতীয় শ্রেণীর মস্তিষ্কের জন্য এই হৈ চৈ শুরু করা তেমন বিস্ময়কর নয় যে, সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে এবং গনতন্ত্র তার স্থান গ্রহণ করতে যাচ্ছে।

পাশ্চাত্যের কাংখিত এক মেরুর বিধান চক্ষের পলকে অস্তিত্ব লাভ করা সম্ভব ছিলনা। সুতরাং এক সর্বাত্মক এক মেরুর ব্যবস্থা চালু হওয়ার আগে সাময়িক কৌশল হিসাবে কিছু বিষয় প্রস্তাব করা হয়েছে, যাতে সত্যিকার বিপদ আয়ত্বের বাইরে চলে না যায়। নিচে এমন কিছু সাময়িক ব্যবস্থা উল্লেখ করা হচ্ছে যা কিছুটা হলেও দেখা দিয়েছে।

(১) ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি (২) ইরান-ইরাক যুদ্ধ (৩) তুরস্কের সামরিক বিপ্লব (৪) আফগানিস্তানে রাশিয়ার সৈন্য সমাবেশ এবং দীর্ঘ যুদ্ধ (৫) পাকিস্তানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় গড়িমসির চেষ্টা এবং প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের হত্যা (৬) সুদানের গৃহযুদ্ধ এবং (৭) মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর উপর সামরিক হস্তক্ষেপ ইত্যাদি।

যুদ্ধের পরিভাষায় সালমান রুশদীর Satanic Verses এর প্রচার একটা Probing Attack ছিল।

পাশ্চাত্যের নিজের ধারণা অনুযায়ী তাদের এক মেরু ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা কার্যকর ভাবে ১৯৯৩ সালের শেষের দিকের পূর্বে অসম্ভব ছিল। আর এই

সময়ের মধ্যে বিশ্বে এমন কোন বিষয়- যার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এক দিকে এই অস্তিত্ব গ্রহণকারী এক মেরুর ব্যবস্থাকে লন্ডভণ্ড করে দেবে এবং অন্য দিকে ইসলামের সত্যিকার হুমকিকে বল্গাহীন করে দেবে- পাশ্চাত্যের জন্য ছিল মৃত্যু।

ঠিক এ সময়ই ইরাক কুয়েতে সৈন্য সমাবেশ ঘটায়। কুয়েতে ইরাকী দখল যে কোন উদ্দেশ্যেই হোকনা কেন, এতে দু'টি বিষয় পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল, যা পাশ্চাত্যকে মৃত্যুর মুখোমুখি করতে পারতো। মুসলিম বিশ্ব যদি তেলের বিশ্ব বাজার এবং তার উৎপাদনের স্তরকে নিজেদের মর্জি মতো নির্ধারণ করতে সক্ষম হতো তাহলে দু'টি বিষয়ই অর্জিত হতো।

এখন মুসলিম বিশ্ব- মরক্কো থেকে ফিলিপাইন পর্যন্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বস্তুগত, আধ্যাত্মিক, চিন্তা আর আন্দোলনের দিক থেকে যে ধরণের পরিস্থিতি অতিক্রম করছে, মুসলিম বিশ্বের কোন উপাদান, চাই তা সাদ্দাম হোসাইনই হোকনা কেন- তার কোন কার্য পাশ্চাত্যের জন্য এমনই বিপদজনক পরিণতি ডেকে আনতে পারে, যতটা করতে পারে কোন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব এবং ইসলামের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোন দেশের তৎপরতা। এর একমাত্র কারণ এই যে, সমকালীন ব্যবস্থা এবং পাশ্চাত্য শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করার ফলাফল আবশ্যিকভাবে সেটাই দেখা দেবে, যা হচ্ছে সারা বিশ্বে ইসলামী আন্দোলনের দর্শনীয় লক্ষ্য অর্থাৎ। يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون - তারা হীন অপদস্থ হয়ে নিজেদের হাতে জিযিয়া প্রদান করবে। যাকে ইতিবাচকভাবে كلمة الله هي العليا অর্থাৎ আল্লাহর বাণীই উর্ধে থাকবে বলে অভিহিত করা যায়।

পকিস্তানে শরীয়তী বিধান জারী হোক বা সুদানে, আফগানিস্তানে বা তুরস্কে ইসলামী বিধান প্রর্বতিত হোক, ওয়াকেফহাল মহল জানে যে, এখন এ পথে বিশ্ব কুফ্রীর ইমাম তথা أئمة الكفر ব্যতীত আর কেউই বাধা নয় এবং অবিলম্বে হোক, বা বিলম্বে, কোন সরাসরি সংঘাতই কেবল তাদেরকেও পথ থেকে অপসারিত করতে পারে।

আজ থেকে ২০/২৫ বৎসর পূর্বে মুসলিম বিশ্বের শাসকরা পাশ্চাত্যের গান গাইতো এবং তাদের ভাষায় কথা বলতো। কারণ তারা ভালো করেই জানতো যে, তাদের শক্তির উৎস পাশ্চাত্যে রয়েছে। কিন্তু এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। এখন মুসলিম বিশ্বের একজন স্বৈরাচারী শাসকও জানে

যে, তাদের শক্তির উৎস তাদের জনগণ। পাশ্চাত্যও একথা ভালো করেই জানে যে, সে ব্যবস্থা এখন আর কোন দিন ফিরে আসবেনা। তারা একথাও জানে যে, মুসলিম বিশ্বের শাসকরা যাই হোকনা কেন এবং তারা নিজ নিজ গন্ডীতে যেমন ব্যবস্থাই পরিচালনা করুননা কেন, বিগত ৫০ বৎসরের মানসিক পরিবর্তন একথা প্রায় নিশ্চিত করে তুলেছে যে, তাদের জনগণের শক্তির উৎস হচ্ছে আসল ইসলাম। তাই পাশ্চাত্য বিশ্বাস করে যে, তাদের ব্যবস্থাকে যে কোন উপায়েই চ্যালেঞ্জ করা হোকনা কেন এবং যার কুঠারই তাকে আঘাত করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত তার পতন ঘটবে ইসলামী জীবন বিধান বাস্তবায়ন দ্বারা। আর যখন অনাগত শক্তির উৎস হবে ইসলাম, তখন এটা সম্পূর্ণ সম্ভব যে, পাশ্চাত্য হাজার বৎসরের জন্য ধরা পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চহ্ন হয়ে যাবে।

অতঃপর আরো সম্মুখে অগ্রসর হয়ে সাদ্দাম হোসাইনের মতো বিচক্ষণ ও সামরিক মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ সেই সব ইসলামী ব্যক্তিত্বের মুকাবিলায় পাশ্চাত্যের জন্য বেশী বিপদজনক হবে, যারা নির্ভেজাল রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক বা দীনী পটভূমির ধারক-বাহক হবেন। চাই তারা আন্দোলনকারীই হোকনা কেন। কারণ সাম্প্রতিক আন্দোলন পাশ্চাত্যকে স্বীকার করতে বাধ্য করেছে যে, এসব রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং দ্বীনী ব্যক্তিরা চিন্তার দিক থেকে পাশ্চাতের জন্য যতই Potential Danger তথা প্রচ্ছন্ন বিপদ হোকনা কেন, কিন্তু তাদের মধ্যে পাশ্চাত্য ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এবং অনিশ্চয়তা ও নাজুকতার চূড়ান্ত পর্যায়ে আপোষের পথ অবলম্বন করার দুর্বলতা অবশ্যই পাওয়া যায়। অথচ সামরিক মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের বৃত্ত খুবই সীমিত হয়ে থাকে। এটা বাস্তব সত্য যে, পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে যে বস্তুটা গোটা মুসলিম বিশ্বের সামরিক ব্যক্তিদেরকে প্রলুব্ধ করতো এবং পাশ্চাত্য যাকে পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করতো, বর্তমানে তা পাশ্চাত্যের জন্য সবচেয়ে বেশী Counter Productive তথা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১ জুন ১৯৯০ থেকে ১ মার্চ ১৯৯১ পর্যন্ত সময়ে ফিলিস্তীন বিষয়ে বাগদাদ সম্মেলন, কুয়েতে ইরাকের সামরিক অভিযান ও দখলদারী মার্কিন এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য বাহিনীর উপসাগরে আগমন, কায়রোয় আরব লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠান এবং ব্যর্থতা, ইরাকের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অবরোধ, ১৯৯০

এর নভেম্বর মাসে জাতিসংঘের যুদ্ধের প্রস্তাব অতঃপর স্থল, নৌ এবং বিমান যুদ্ধের মতো ঘটনাবলী সংঘটিত হয়। এতে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুসলিম মিল্লাতের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ব্যক্তিরা সর্বতোভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। এমন নাজুক পরিস্থিতিতে, যখন গোটা উম্মত কয়েক শতাব্দী পর এহেন নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে, তারা যে সব কর্মতৎপরতা চালিয়েছেন এবং যে ভাবে পাশ্চাত্য জাতিগুলোকে তাদের অভিপ্রায় পুরণ করতে বাধা দান করেছেন- ওয়াকেফহাল মহলের নিকট তা গোপন নয়। কিন্তু এখানে চিন্তা করার দু'টি পর্যায় রয়েছে। এক: এ সংকট দেখা দেয়ার পর উম্মতের হিফাযতের জন্য মুসলিম শাসকরা তাৎক্ষণিক কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? দুইঃ এ সংকটের পূর্বে যখন পাশ্চাত্য তার মতলব সিদ্ধির আয়োজন করছিল, তখন আমাদের শাসকরা পূর্ব থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হিসাবে উম্মতের বৃহত্তর স্বার্থে কি বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন?

বাস্তব সত্য এই যে, প্রথম বিষয়ে উম্মতের দণ্ডমুণ্ডের মালিকরা যে সকল প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, সামগ্রিকভাবে তা বিস্ময়কর এবং প্রশংসনীয় হওয়া সত্ত্বেও মৌলিকভাবে দুঃখজনক। কারণ তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন এমনসব লোক, যারা ছিল শাসনকর্তা। তাদের সমস্ত প্রচেষ্টার গোড়ায় ভীরুতা-কাপুরুষতা কার্যকর ছিল। আর দ্বিতীয় বিষয়ে মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ শাসক শ্রেণী এক্ষেত্রে যথেষ্ট দুর্বলতা দেখিয়েছেন। বিশেষ করে উপসাগরের কিছু আরব দেশ, যারা তেলের সম্পদে সম্পদশালী, তাদের যে রীতি, আচরণ ছিল, তাতে কোন না কোন এক দিন গোটা উম্মতকে এক কঠিন সংকটের সম্মুখীন হতেই হতো। তারা নিজেরাও লাঞ্ছিত-অপদস্থ হয়েছে এবং গোটা উম্মতকেও কঠিন সংকীর্ণতায় নিক্ষিপ্ত করেছে। পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষকে নিঃসন্দেহে দৃঢ়তা ও সত্যানুরাগ প্রদর্শন করতে দেখা গেছে। আর এ সময়ের এটাই ছিল শুভ দিক।

এ যুদ্ধ গোটা উম্মতকে এমন ক্রান্তি লগ্নে এনে দাঁড় করিয়েছে, যেখানে এ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য যে, নিকট অতীত কালের কাহিনীকে চিরতরে বিসর্জন দিয়ে ভবিষ্যতে প্রবেশ করতে হবে। এটা নাজুক, দুঃখজনক এবং আনন্দদায়কও। নাজুক এজন্য যে, গোটা বিশ্ব মৃত্যুর পূর্ব লক্ষণের মুখোমুখি। দুঃখজনক এ জন্য যে, উম্মতের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর দুর্বলতা আর ত্রুটি স্পষ্ট বিজয়কে বিলম্বিত করে দিয়েছে। আর আনন্দদায়ক এ জন্য যে, যা কিছু ঘটে থাকুক, ভবিষতও মুসলিম উম্মতেরই আয়ত্বাধীন।

বিশেষ পরিস্থিতি

১. ইসলাম ও মুসলিম উম্মাতের সত্যিকার আবেগ-অনুভূতি অস্বীকার করে এবং মুসলমানদের পুরাতন আশা-আকাংখা দলিত-মথিত করে মুসলিম বিশ্বের কোন কোন দেশ এবং বিশেষ করে তেল উৎপাদনকারী দেশ সমূহের শাসকরা এমনসব পদক্ষেপ গ্রহণ আর এমন সব চালচলন অবলম্বন করে চলেছে, যাদের উদ্দেশ্য ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকা এবং নিজেদের গদীকে সুদৃঢ় করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের এহেন আচরণ আর কর্মকান্ডের প্রত্যক্ষ ফলে উম্মত এহেন সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। উপসাগরীয় দেশগুলো নিজেদের বিজয়ের বড় বড় বুলি আওড়ানো সত্ত্বেও তারা যে শাস্তি পেয়েছে তা তাদের পাওয়ার যোগ্য শাস্তির দশ ভাগের এক ভাগও নয়। হয়তো এর কারণ আল্লাহ্‌র সেই অনুগ্রহ, যা সেখানকার জনগণের ইসলামের সঙ্গে সম্পৃক্ততার কারণে তাদের উপর করেছেন। নিজ নিজ ক্ষমতার আওতায় জিহাদের প্রাণ সত্তাকে দুর্বলতর করে তোলা, ইসলামী মূল্যবোধের সত্যিকার প্রতিনিধিত্বকারী শক্তিকে নিম্নগামী করা, সাধারণ আর বিশেষ লোকদের মধ্যে ইসলামের প্রাণসত্তার পরিবর্তে আরামপ্রিয়তা, বিলাসিতা আর সুখ-স্বচ্ছন্দ্যকে উৎসাহিত করা, নিজ নিজ দেশে কার্যকর সৈন্য না রেখে কাফের, মুশরিকদেরকে নিজেদের হিফাযতের ঠিকাদারী দেয়া সেসব শাসকদের সুচিন্তিত স্কীম এবং একটা প্রয়োজন ছিল। সম্ভবত প্রথম বারের মতো নিজেদের ইজতিহাদের রহস্য তাদের নিকট উম্মোচিত হয়ে থাকবে যে, ইহুদীদের আর্থিক সাম্রাজ্যের আসল শক্তির উৎস তাদের সম্পদ নয়, বরং তা হচ্ছে আর্থিক সাম্রাজ্য রক্ষা করার সামরিক যোগ্যতা। অথচ এই শাসকেরা অত্যন্ত কুৎসিত পন্থায় তাদের অনুসরণ করার সংকল্প করেছিল। ওয়াকেফহাল মহলের নিকট একথা তেমন একটা আলোচনার বিষয় নয় যে, সউদী আরব এবং কুয়েত এর শাসকরা পশ্চিমা সৈন্যদেরকে ডেকে এনেছে, না তারা নিজেরাই এসে পড়েছে, যাদেরকে বাধা দেয়া এবং যাদের অগ্রাভিযানে বাধ সাধার শক্তি সামর্থ্য তাদের ছিলনা।

২. উপসাগরীয় যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী পুনর্জাগরণের ঝড়ো হাওয়াকে ঠেকানো, যা রাবাত থেকে মিন্দানাও পর্যন্ত কোটি কোটি জনগণের দোর গোড়ায় আঘাত হানছিল। সাদ্দাম হোসাইনের কর্মকাণ্ড করতে গিয়ে যে কোন উদ্দেশ্যেই হোকনা কেন, তা এমন এক পথ খোলার

সমার্থক হতো, যাতে তৎক্ষণাৎ পাশ্চাত্য জগৎ লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতো। মুসলিম শাসকরা সামগ্রিকভাবে এ থেকে হাত গুটিয়ে রেখেছিল।

৩. কেবল এটাই নয় যে, পথখোলা রাখায় সেসব শাসকরা কোন সহযোগিতা করেনি; বরং কার্যত তারা নিরপেক্ষও ছিলনা। বরং পাশ্চাত্যের সাথে রাজনৈতিক, নৈতিক এবং আইনগত দিক থেকে তারা শরীক ছিল। আর এমন করতে গিয়ে তারা নিজেদের জনগণের চেয়ে বেশী পাশ্চাত্য এবং নিজেদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেছে।

৪. একদিকে যেখানে উম্মতের মধ্যে প্রাপ্ত উপকরণের দরজা ইরাকের জন্য বন্ধ ছিল, অন্যদিকে সেখানে মুসলিম বিশ্বে প্রাপ্ত উপকরণসহ সারা বিশ্বের উপকরণের দরজা পাশ্চাত্যের সেসব চেষ্টার জন্য খোলা ছিল, যে প্রচেষ্টা তারা চালাচ্ছিল ইসলাম আর মুসলমানদেরকে বশ করার জন্য।

৫. যে চেষ্টার দ্বারা এ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হতে পারে, পাশ্চাত্য বিশেষ করে আমেরিকা তেমন চেষ্টাকে স্যাবোটাজ করে আর মুসলিম শাসকরা বসে বসে দেখতে থাকে।

৬. O I C তথা ইসলামী সম্মেলন সংস্থার বর্তমান কাঠামোর কোন প্রয়োজন উম্মতের নেই, যুদ্ধ এ অনুভূতি তীব্র ভাবে জাগ্রত করে তুলেছে।

৭. এহেন পরিস্থিতিতে ইরাক যেভাবে অবস্থার মুকাবিলা করেছে, তা উন্নয়নশীল দেশগুলোর ইতিহাসে নজীরবিহীন। ইরাক কুয়েত এবং সউদী আরব সহ গোটা উম্মতের যুদ্ধ কার্যত একাই চালায়, পক্ষান্তরে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের সকল ইসলাম দুশমন শক্তি মুসলিম মিল্লাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায় সম্মিলিত এবং ঐক্যবদ্ধভাবে। ৪৫ দিনের এই যুদ্ধ ছিল ইরাকের উন্নত সামরিক দক্ষতার নমুনা। ইহুদীবাদের প্রতিষ্ঠিত Mechanical Solidarity তথা রাসায়নিক সংহতির ধূলোবালি অপসৃত হলে সত্য প্রকাশ পাবে যে, ময়দান কার হাতে ছিল। ইরাকের বীরত্ব, সাহসিকতা আর বিচক্ষণতা যে নয়া অধ্যায় উম্মোচন করেছে, এ ব্যাপারে এতটুকু দ্বিমত নেই। আগামী দিনগুলোতে এই নয়া অধ্যায় নূতন কাফেলার জন্য বছরের পর বছর ধরে পথের দিশা হয়ে থাকবে। আরব কুয়েতে থাকুক, বা সাউদী আরবে, এই মনস্তাত্বিক সম্বলই হবে তাদের পুঁজি। ইতিহাস কখনো একথা ভুলতে পারবেনা যে, উম্মত যেখানে একটা সমষ্টি আর যে উম্মতের উপর হামলা করেছিল পাশ্চাত্য, ইসলাম বিরোধী ইহুদী এবং অন্যান্য শক্তি

সম্মিলিত ভাবে এবং কুয়েত, ইরাক আর সাউদী আরবের নামে তিনটা ফ্রন্ট খোলা হয়েছিল এবং এতে সেই ফ্রন্টেই উম্মতের সবচেয়ে কম ক্ষতি হয়েছে। আর সেই ফ্রন্টেই সবচেয়ে বেশী ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে দুশমনকে। বিগত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাসে এটা একটা বিরল দৃষ্টান্ত, যার কোন নজীর নেই। সাধারণ মানুষের জন্য এটা একটা প্রহেলিকা, কিন্তু ইতিহাস আর সামরিক বিশেজ্ঞরা জানেন যে, আসল রহস্য কি?

দ্বিতীয় পর্যায়

প্রথম পর্যায় সমাপ্ত হয়েছে এবং ইতিহাস দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। এখন নিজের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে ভবিষ্যতের পদক্ষেপ নিয়ে চিন্তা করা উম্মতের জন্য অপরিহার্য। উপরন্তু ভবিষ্যতে দেখা দিতে পারে এমন সব সম্ভাবনা আর আশংকার পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে।

সন্দেহ নেই যে, উম্মত এই যুদ্ধে তার কাংখিত লক্ষ্য অর্জনে পুরোপুরি সফল হয়নি। তবে দুশমনদের আঘাতের শক্তি আর তার ধ্বংসকারিতা হ্রাস করার ব্যাপারে অবশ্যই সফল হয়েছে।

৮. প্রশ্ন হচ্ছে সেই কার্যকারণগুলো কি ছিল যার এমন বিষময় ফলাফল দেখা দিল? এ প্রসঙ্গে নিচের বিষয়গুলো সম্মুখে আসে ঃ

১. কিছু ব্যতিক্রমসহ সামগ্রিক ভাবে মুসলিম উম্মার Elite শেণী সমস্যার মূল কারণ অনুধাবন করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, এর কারণ গুলো নিম্নরূপ:

ক. মুসলিম দেশের শাসক হোক, কি মুসলিম সংস্থার প্রধান, পাশ্চাত্য এবং বাহ্যত তার রকমারী ভয়ে সার্বিকভাবে তারা ভীত।

খ. কোন কোন ইসলামী আন্দোলনে বিশেষ ভাবে যে Syndrome বা লক্ষণ পাওয়া যায়, যার প্রভাবাধীনে তাদের মধ্যে চেতনার স্তরে পাশ্চাত্য সম্পর্কে দূরত্ব ও বিরোধ পাওয়া যায়, কিন্তু অবচেতন স্তরে পাওয়া যায় নৈকট্য ও চাটুকারিতা। এর অপরিহার্য ফল এই দাঁড়ায় যে, এসব আন্দোলন এবং তাদের ব্যক্তিরা সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য হারায়ে বসে। এখন তাদের মধ্যে আর সেই তীক্ষ দৃষ্টি নেই, যা হাজার পর্দার ভেতর থেকেও বাতিলকে

খুঁজে বের করতে পারে।

গ. মুসলিম শাসকদের বিপুল সংখ্যার মধ্যে জিহাদের ব্যাপারে প্রচণ্ড ভীতি দেখা যায়।

ঘ. এমন সব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বড় বড় 'আলেম'- যারা শাসক আর জনগণের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম, তারা বিশ্বব্যাপী ব্যক্তিত্বের অধিকারী হলেও তাদের মধ্যে সত্যিকার জিহাদের প্রাণসত্তা স্তিমিত।

ঙ. অধিকাংশ ইসলামী আন্দোলনে রয়েছে নিছক পাশ্চাত্যের অনুকরণে প্রচলিত সাধারণ প্রচার। এটা আগাগোড়া পাশ্চাত্যের অনুকৃতি।

চ. বিগত ২০ বৎসর থেকে ইসলামী আন্দোলনের লোকেরা তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর কাজ কারবারের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে।

ছ. মুসলিম উম্মার মধ্যে চিন্তা, কর্ম, অর্থ এবং সংস্কৃতি পর্যায়ে এমন কিছু চেষ্টার উন্মেষ ঘটেছে, যার লক্ষ্য মুসলিম উম্মার মধ্যে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি করার চেয়েও বেশী হচ্ছে বিশ্ব ঐক্য সৃষ্টি করা।

জ. কোন কোন মুসলিম শাসক এখনও ইসলামকে নিজেদের জন্য হুমকি মনে করে।

ঝ. সারা বিশ্বে কর্মরত মুসলিম দ্বীনী, একাডেমিক, সাংস্কৃতিক এবং বিজ্ঞান সংস্থায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইসলাম বিদ্বেষী শক্তির প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং নানা উপায়ে ইসলামী শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা।

আগামী দিনের সংঘাত

এহেন পরিস্থিতিতে বর্তমানে এমন এক সংঘাতের সূচনা হবে, যা হবে পাশ্চাত্যের জন্য জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ের মতো। পাশ্চাত্যের ইসলাম বিদ্বেষী শক্তিগুলো সর্বশক্তি নিয়োজিত করে চেষ্টা চালাবে ইসলামী শক্তিকে পরাজিত করার জন্য। এজন্য তারা নিম্নোক্ত প্রচেষ্টা চালাতে পারে।

১. মুসলিম বিশ্বে বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে হতে পারে, এমন শক্তির (Potential) বিনাশ সাধন করা। এই শক্তি আর্থিক, বস্তুগত, দলগত, সাংস্কৃতিক, সামরিক, Strategic, Logistic যে কোন ধরনের হতে

পারে। বিশেষ করে ইরাক, পাকিস্তান, ইরান, মিশর এবং তুরস্কের Potential ধ্বংস বা সীমিত করার কাজ তীব্র হবে।

২. মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যাবলীর রাশিয়ার অনুকূলে সমাধান করা এবং তথাকার ইসলামী শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টায় পাশ্চাত্য রাশিয়ার অনুকূলে সহযোগিতা করবে।

৩. জাতিসংঘকে আরো কার্যকর করা হবে, যাতে মুসলিম উম্মার মধ্যে সৃষ্ট ঐক্য শক্তি সঞ্চয় করতে না পারে। মুসলিম উম্মার ঐক্য বিষয়ে পাশ্চাত্য ভীষণ শংকিত।

৪. গোলান উপত্যকা, গাজা অঞ্চল এবং পাশ্চিম জর্দান পূণর্দখলের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেয়া হবে। এসবের লক্ষ্য হবে ফিলিস্তিণীদের অধিকার পুনর্বহাল নয়, বরং ইসরাইলের অস্তিত্বকে আরো শক্তিশালী করা। কারণ এসব অঞ্চল অধিকারে রাখা এখন ইসরাইলের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় নয় বরং এসব এলাকা অধিকার করা ইসরাইলের অস্তিত্বের জন্য Counter Productive তথা বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে।

৫. এমন সব তীব্র প্রচেষ্টা চালানো হবে, যা দ্বারা মুসলিম উম্মার মধ্যে প্রাপ্ত একাডেমিক এবং কারবারের প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পূর্ণরূপে বিশ্ব ব্যবস্থাধীন সংস্থাগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবে।

৬. বিভিন্ন দেশে ইসলামী আন্দোলনের অভ্যন্তরে শুদ্ধির জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চাপ তীব্র হবে। অধিকাংশ আন্দোলন এই তীব্র চাপ সহ্য করতে পারবেনা। ফলে তারা সমঝোতার জন্য প্রস্তুত হবে। আর এটা হবে এজন্য যে, বিগত কয়েক দশকে আন্দোলণগুলো অপ্রয়োজনীয়, অস্বাভাবিক বিস্তৃতি লাভ করেছে। তারা এই বিস্তৃতির বোঝা সামাল দিতে অক্ষম।

৭. ইকামাতে দীনের জন্য যারা সত্যিকার চেষ্টা চালাবে, তাদের জন্য কঠিন দিন আসবে। পাশ্চাত্য সর্বস্তরে তাদেরকে Marginalise তথা প্রান্তিক করার চেষ্টা চালাবে।

৮. এমন সব ইসলামী আন্দোলন আর ইসলামী সংগঠন গড়ে তোলা হবে, যে গুলোর লক্ষ্য হবে অ-সম্পৃক্ত ইসলামী শক্তিকে সমকালীন বিশ্ব ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা।

৯. মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে এমন সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু করা হবে, যার লক্ষ্য হবে ইসলামী মূল্যবোধ, ঐতিহ্য, আর ধ্যান ধারণার সাথে তাদের দূরত্ব সৃষ্টি করা।

১০. গণমাধ্যমের কোন কোন বিশেষ বিভাগে যথা CNN বা CBS News দ্বারা গোটা মুসলিম বিশ্বে Mechanical Solidarity তথা কারিগরী সংহতি স্থাপনের চেষ্টা করা হবে।

১১. মধ্যম এবং নিম্নস্তরের আলেমদের উপর কিছু কিছু বড় কিন্তু শাসক শ্রেণীর মধ্যে পরিচিত আলেমদের পক্ষ থেকে চাপ প্রয়োগ করা হবে, যেন তারা জনগণকে নিয়ন্ত্রণে রাখে।

১২. বিগত বছরগুলোর সম্পূর্ণ বিপরীতে মুসলিম বিশ্বের সামরিক শাসক এবং সামরিক শ্রেণী পাশ্চাত্যের জন্য অতীব অপছন্দনীয় সাব্যস্ত হবে। মুসলিম বিশ্বে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে বিপুলভাবে প্রশংসিত করে যাতে আরো সুদৃঢ় করা হয়, সে জন্য তীব্র প্রচেষ্টা চালানো হবে। বিগত কয়েক দশকে মুসলিম দেশগুলোতে সেনাবাহিনী থেকে যেসব খারাব লোকের অবির্ভাব ঘটেছে, এখন ধীরে ধীরে ততোধিক ভালো লোক সম্মুখে আসার সমূহ সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। মূলত এর কারণ সেনাবাহিনীর শক্তির উৎসের পরিবর্তন।

১৩. মধ্যপ্রাচ্যে এমন এক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হবে, যার মূল শক্তি থাকবে ইসরাইলের নিকট।

১৪. ইসরাইল তার আচরণে এমন নমনীয়তা সৃষ্টি করবে, যা দ্বারা মূলত তার লক্ষ্য হবে একথা বিশ্বাস করানো যে, প্রতিবেশীদের সঙ্গে ইসরাইলের সহ অবস্থানের সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়নি। সামরিক আর রাজনৈতিক স্তরেই নয়, দীনী স্তরেও ইসরাইলকে গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা চালানো হবে।

১৫. ইকামাতে দীনের এমনসব চেষ্টাকে ভালো নজরে দেখা হবে, যারা নিজেদের তৎপরতার গন্ডীকে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা চালাবে, যারা পাশ্চাত্যের জাতিয়তাবাদের সৃষ্ট দেয়াল ভাঙ্গা থেকে বিরত থাকবে।

এজন্য নিম্নের কোন একটা পদ্ধতি অবলম্বিত হতে পারে।

১. উম্মতের কোন কোন মত-পথ আর মযহাব, যারা খিলাফাত বিষয়ে সংখ্যাগুরু জনশক্তির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে; তাদের মধ্যে কিছু লোককে ক্রীড়নকে পরিণত করে খিলাফাতের এমন ব্যাখ্যা করা হবে, যাতে উম্মতের বিপুল জনগোষ্ঠী মানসিক ভাবে বিশৃংখলার শিকারে পরিণত হয়।

২. কোন কোন মহল থেকে নব পর্যায়ে খিলাফাতকে জীবিত না করে O I C -র রীতিতে প্রচলিত ব্যবস্থাকে যথেষ্ট এবং বিকল্প সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা হবে। এতে ইসলাম বিদ্বেষী শক্তির অনুপ্রবেশ আর প্রভাব বিস্তারের সমস্ত সম্ভাবনা আর অবকাশ বিদ্যমান রয়েছে। ওআইসির গঠন কাঠামো মৌলিক ভাবেই ইসলামের চেয়ে বেশী পাশ্চাত্য ঘেঁষা, যা কখনো মুসলিম উম্মাতের আশা-আকাংখ্যা পুরণ করতে পারেনা।

৩. হতে পারে কোন পর্যায়ে মুসলিম উম্মার তীব্র চাপ দেখে বা তাদের মধ্যে কার্যকর প্রবল আবেগের ভয় অনুভব করে Peremptive Strike হিসাবে এমন খিলাফাত প্রতিষ্ঠাকে নিজেদের পক্ষ থেকে প্রশ্রয় দেয়া হবে বা কার্যত প্রতিষ্ঠা করা হবে, যেমন কিছু উসমানী খিলাফাতের অবসানকালে কামনা করতো আগাখান।

এসব আশংকাজনক কর্মকৌশল সত্ত্বেও মুসলিম উম্মত আগামী দিনগুলোতে দৃঢ়তা-স্থিরতার দিকে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবে এবং মুসলিম উম্মাতের সামগ্রিক শক্তি এবং তার কার্যকর ও ঐক্যবদ্ধ প্রকাশ ইসলামের দুশমনদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করবে এ আশাবাদের পক্ষে পর্যাপ্ত সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে। এরূপ প্রত্যাশিত ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সম্ভাব্যতা নিম্নরূপ:

১. পরিস্থিতির বর্তমান পরিবর্তন আমেরিকা, জার্মানী এবং জাপানের মধ্যে আরো দূরত্ব সৃষ্টি করবে, যাতে পাশ্চাত্য দেশগুলো মতভেদে জড়িয়ে পড়বে।

২. পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের এসব ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতে গোটা মুসলিম উম্মাহ ভীষণ অস্থিরতার শিকার হবে, উম্মতের মধ্যে দেখা দেবে অস্বাভাবিক পরিবর্তন। এসব পরিবর্তন নিম্নরূপ হতে পারে ঃ

ক. উম্মতের মধ্যে শ্রেণীগত পরিবর্তন দেখা দেবে। আগামী দিনগুলোতে বর্তমান উচ্চ শ্রেণী নেপথ্যে গমন করবে। কিন্তু এ পরিবর্তন হবে মুসলিম

উম্মার বিপুল জনগোষ্ঠীর পছন্দ অপছন্দের স্তরে। বিপুল জনগোষ্ঠীর আশা আকাংখার সয়লাব গোটা উম্মতকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

খ. মুসলিম উম্মার মধ্যে বর্তমান ওলামা শ্রেণী দুনিয়ার সংশ্লিষ্টতা থেকে যতটা মুক্ত থাকবে, আগামী দিনগুলোতে পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা ততটা দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, সঠিক ফলাফল নির্ণয়কারী, কর্মঠ এবং উত্তম সিদ্ধান্তকারী বলে প্রমাণিত হবে।

গ. তৈল সমৃদ্ধ দেশগুলোর শাসক শ্রেণী যে পক্ষই অবলম্বন করুক না কেন, সাধারণ আরবদের আত্ম মর্যাদার জন্য পাশ্চাত্য অসহনীয় হয়ে উঠবে। আরবদের আত্মমর্যাদার এ সয়লাব রোধ করা অদূর ভবিষ্যতে মধ্য প্রাচ্যের কোন শক্তিশালী শাসকের পক্ষেও সাধ্যাতীত হয়ে পড়বে।

সমীক্ষার সারকথা এই যে, আগামী দিনগুলো হবে ভীষণ পরীক্ষার এবং দ্বিতীয় পর্যায় হবে প্রথম পর্যায়ের চেয়ে বেশী প্রাণান্তকর। অবশ্য মুসলিম উম্মার বিজয়ের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটবে। এর দুটি লক্ষণ এ পর্যায়ে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

প্রথম লক্ষণ এই যে, ইসলাম বিদ্বেষীরা মুসলিম বিশ্বের যতই ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে, তাতে তারা সফল হয়নি। উম্মতের শতকরা ৯০ থেকে ৯৮ ভাগ Potential আল্লাহ্র মেহেরবানীতে নিরাপদ আছে।

দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, আগামী দিনগুলোতে মুসলিম উম্মার Potential কে পদানতকারী শক্তির চেয়ে বেশী শক্তিশালী গোষ্ঠী উপস্থাপন করতে উম্মত সফল হবে। এর লক্ষণ এখন থেকে স্পষ্ট পরিস্ফুট।

আর এসব কথার মূল কথা এই যে, আগামী মাস আর বৎসরের রহস্য একটা Lull তথা সাময়িক থমথমে অবস্থার চেয়ে বেশী কিছু নয়। কার্যত গোটা মুসলিম উম্মাহ সে দীর্ঘ অভিযানে রওয়ানা হয়েছে, যাকে বলা হয় মহা সমর!

পরিশিষ্ট - ২

বিশ্বজোড়া ইবলিসী ব্যবস্থা

বর্তমান সভ্যতা আর্নল্ড জে টয়েনবী (১৮৮৯-১৯৭৫) যাকে 'বর্তমান যুগ'[১] এবং আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮) যাকে 'আলমে পীর'[২] আখ্যায়িত করেছেন- সর্বশেষ এবং সিদ্ধান্ত-কর পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এই পর্যায় তার মৃত্যু অথবা পুনরুত্থানের সিদ্ধান্ত করবে।

কাল প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। কিন্তু সকল পরিবর্তন এক রকম নয়। কোন কোন পরিবর্তন বহু শতাব্দীর পর দেখা দেয় এবং বহু শতাব্দীর সিদ্ধান্ত করে। বর্তমান সভ্যতার নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার দিকে আবর্তন এমনি এক পরিবর্তনের প্রচেষ্টা। এটা বুঝান সহজ নয়। পরিস্থিতির নাজুকতা ও জটিলতার প্রেক্ষিতে কতিপয় নতুন শব্দ এবং পরিভাষার আশ্রয় নেয়া যেতে পারে।

শয়তানের কার্যক্রমতো মানব ইতিহাসের সূচনা থেকেই চলে আসছে এবং সে শিরকের প্রচার-প্রসারের জন্য নিয়মিত চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু তার সংঘবদ্ধ চেষ্টার প্রকাশ তখন ঘটে, যখন সে নবীদের আন্দোলনের বিরোধিতা করে। এটা সত্য কথা যে, বাতিল ব্যবস্থার এত ব্যাপক প্রচার-প্রসার যতটা আজকাল হচ্ছে, মানব ইতিহাসে হয়ত ততটা আর দেখা যায়নি। শয়তানের সৃষ্ট বিপর্যয় সমগ্র সৃষ্টি জগতকে তার আওতাভুক্ত করেছে। জল স্থল অন্তরীক্ষ প্রাণী জগত, উদ্ভিত জগত, জড় জগত, মানব বংশ, চরিত্র, দেহ, আত্মা কোন কিছু হয়ত তার ভাংগাগড়ার হাত থেকে মুক্ত নয়। প্রতিটি ব্যক্তি, প্রতিটি প্রাণী, প্রতিটি বস্তু বিপর্যস্ত। পাশ্চাত্যের সৃষ্ট বর্তমান সভ্যতা এই মন্দ বিধানেরই প্রতিচ্ছবি, যার বিপর্যয় মানব জীবনের প্রতিটি বক্তিগত এবং সামাজিক দিককে দারুণ ভাবে প্রভাবিত করছে।

কিন্তু এখন যে নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে এবং যার স্পষ্টতর রূপরেখা সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ১৩ এপ্রিল ১৯৯১ সালে পেশ করেছেন, তা হচ্ছে সেই মন্দ ব্যবস্থার নিকৃষ্টতম রূপ, যা অবিলম্বে সারা বিশ্বকে গ্রাস করতে বদ্ধপরিকর। মিলিটারি কলেজ আলাবামায়, (Militaey College, Alabama) ভাষণ দান প্রসঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার রূপরেখা বর্ণনা করেছেন। শব্দের মারপ্যাঁচের পরিপ্রেক্ষিতে সেই বিশ্ব ব্যবস্থা সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর পশ্চিমা

বিশ্ব ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখা যাচ্ছে। কারণ এতে বাহ্যত জাতীয় রাষ্ট্র দর্শন (Nation state theory) এর বিরোধিতা এবং তার মূলোৎপাটন দেখা যাচ্ছে। এই নয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং তার মৌলিক উপাদান- জনসংখ্যা, ভূমি এবং সার্বভৌমত্ব থেকে সম্পূর্ণ নতুন ও জাতীয় রাষ্ট্র দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাখ্যা দেয়। কিন্তু একথা মনে করা ঠিক হবে না যে, নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা জাতীয় রাষ্ট্র দর্শনের পরিসমাপ্তি ঃ বরং তার উন্নত রূপ। এর বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে পরে আলোচনা করা হবে। আপাতত আলোচ্য বিষয় মাত্র দু'টি। একঃ নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা কি? দুইঃ ইসলাম আর মুসলমানদের বিবেচনায় তার মূল্য কি? দ্বিতীয় শিরোনাম সম্পর্কে পূর্ণ আস্থার সঙ্গে একথা বলা যায় যে, ইসলাম এবং নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যে কোন একটিই দুনিয়ার বুকে টিকে থাকতে পারে। আর এর মৌলিক কারণ এই যে, নয়া ব্যবস্থা চালু হওয়া এবং টিকে থাকার কেবল একটাই শর্ত। আর তা হচ্ছে ইসলাম এবং ইসলামী বিধানের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সকল রূপকাঠামোর পরিসমাপ্তি। কারণ ইসলামী কাঠামোর সঙ্গে নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার মেকানিজম প্রায় অবাস্তব ও অকার্যকর।

পূর্বেই নিবেদন করা হয়েছে যে, নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা সুসংবদ্ধ ব্যবস্থার বাতিল প্রচেষ্টার প্রকাশ, এটা কতটা ক্ষতিকর, তা ভালভাবে বুঝেতে হলে তার সঠিক নামকরণ করতে হয় বিশ্ব তাগূতী ব্যবস্থা। এর মূলতো তাওহীদ অস্বীকার। কিন্তু এর প্রকাশের রূপ শত শত নয় বরং হাজার হাজার, যার সম্পর্ক মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগের সঙ্গে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট এর বর্তমান রূপ বুঝাবার জন্য এমন সব পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, যার সম্পর্ক রাজনীতি বিজ্ঞান বা ইতিহাসের সঙ্গে। তাই আগামী ছত্র গুলোতে এদিকেই লক্ষ্য রাখা হবে এবং সহজে বুঝাবার জন্য এটা জরুরী।

ইহুদী মানসিকতা

একথা পুণর্ব্যক্ত করার আদৌ কোন প্রয়োজন নাই যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য চিন্তা ধারা এবং নিকট অতীত ও বর্তমান কালে তার এমন সব রূপ পাওয়া যায়, যার পেছনে রয়েছে বিশ্ব ইহুদীবাদের মন-মস্তিষ্ক। কিন্তু অন্তত বিগত দুইশতাব্দীতে এবং বর্তমান কালেও এর পতাকাবাহী হচ্ছে এ্যাংলো স্যাকশান জাতি (Anglo-Saxons) মুসলমান ছাড়া দুনিয়ার সমস্ত জাতিগুলোর ভাগ্যে তাদের পদলেহন ছাড়া আর কিছুই নাই। এই

কারণে এই বিশ্ব ব্যবস্থার সঙ্গে লড়াই করার প্রয়োজনীয় শর্ত মুসলমান ছাড়া অন্য কোন জাতি পূরণ করতে পারেনা। বিগত দু' বৎসর থেকে বিশ্ব তাগুতী ব্যবস্থার হামলা সর্বগ্রাসী এবং সর্বব্যাপী রূপ নিয়েছে। যে কারণে তা বোঝান দুষ্কর কাজ। এই নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার পরীক্ষামূলক ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে। কিন্তু যথারীতি কার্যক্রম শুরু হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের অব্যবহিত পরে। ১৯৪৫-৮০ পর্যন্ত নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা শৈশবকাল অতিক্রম করে। ১৯৮০-১৯৮৫ সময় টাকে ইতিহাস সৃষ্টিকারী বলা যেতে পারে। এ সময় নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনকারী শক্তিগুলো অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যা কার্যকর করা হবে আগামী কয়েক দশক ধরে। এই সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের মধ্যে তিনটি মৌলিক সিদ্ধান্ত প্রকাশ পেয়েছে অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দোকান সম্প্রসারণ করা, মধ্য প্রাচ্যে শক্তির নয়া ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা এবং ইউরোপের সমস্ত রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান অর্থাৎ ইউরোপীয় পার্লামেন্ট, ইউরোপীয় কমন মার্কেট, ইউরোপীয় ডলার, ইউরোপীয় নয়া উপনিবেশ এবং পারস্পরিক সহায়তা প্রতিষ্ঠা বা পূণর্গঠনের জন্যে ইউরোপীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, যার অধিবেশন (১৫ এপ্রিল ১৯৯১) লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়।

নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকশিত রূপ। এখন এই ব্যবস্থা জাতীয় রাষ্ট্র দর্শন Nation State Theory থেকে আরো অগ্রসর হয়ে যথারীতি Super-Nation Theory-র ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার যথারীতি সূচনা দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরে হলেও প্রকাশ্যে তা ঘোষণা করা হয় কোরিয়া যুদ্ধের পর, ম্যাকস লার্ণার যার ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে We are witnessing the beginning of the end of classical world politics, which was characterized by a world of nation-States, based on the concept of Sovereignty, applying the principles of the balance of power, with war as a frequent result of the internal failures and external pressures.[৩]

আমরা প্রাচীন বিশ্ব রাজনীতির সমাপ্তির সূচনা প্রত্যক্ষ করছি। এই রাজনীতির বৈশিষ্ট ছিল প্রচীন বিশ্ব দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত জাতীয় রাষ্ট্র

যেখানে শান্তির ভারসাম্যের নীতি কার্যকর। কিন্তু আভ্যন্তরীন ব্যর্থতা আর বাইরের চাপের ফলে বারবার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে।

কিছুটা অধিক গ্রহণযোগ্য ভাষায় এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব দেগ হেমারশোল্ড বলেছিলেন:

"We are still in the treansition between institutional systems of international co-existence and constitutional systems of international co-operation"[8]

- আমরা এখনোও আন্তর্জাতিক সহ অবস্থানের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সাংবিধানক ব্যবস্থার মাঝামাঝি অন্তর্বর্তী কাল অতিক্রম করছি।

প্রথম প্রশ্নের দু'টি অংশ আছে, অর্থাৎ দু'টি সম্পুরক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যায়। ১ম প্রশ্ন ঃ নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রয়োজনীয় কেন? এই জন্য পাশ্চাত্যের এত তাড়াহুড়া কেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার সত্যিকার রূপরেখা কি? তার লক্ষ্য এবং সেই জন্য কি পন্থা উদ্ভাবন করা হয়েছে?

১ম অংশ সম্পর্কে দু'টি কথা বলা যায়। ১ম কথা এই যে, রেনেসাঁর ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট পাশ্চাত্য সভ্যতা ক্রমবিকাশের যে মনযিলে পৌঁছেছে দ্বিতীয় পর্যায় তার যৌক্তিক পরিণতি যেহেতু পাশ্চাত্য সভ্যতা পতনের সেই পর্যায়ে এখনো পৌঁছেনি যেখানে তার কাঠামো ধ্বসে পড়বে তাই তার বর্তমান আভ্যন্তরীণ শক্তি তাকে সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য শক্তি যোগাচ্ছে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, যে সময়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা নিজস্ব নির্দিষ্ট গতিতে সম্মুখপানে অগ্রসর হচ্ছিল, ঠিক তখন ১৯২৩ এবং ১৯৭৯ এর মাঝামাঝি সময় মুসলিম বিশ্বে এমন সব ঘটনা ঘটে, যা পাশ্চাত্য সভ্যতার মৃত্যুর সংকেত দিতে থাকে। তাই নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা পাশ্চাত্য জগতের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজনে পরিণত হয়। মুসলিম বিশ্বে প্রকাশ পাওয়া ঘটনাগুলো নিছক চৈন্তিক এবং সামাজিকই ছিলনা বরং দুনিয়ায় বিদ্যমান যাবতীয় অর্থনৈতিক ভৌগলিক প্রতিরক্ষা মূলক এবং কর্ম-কৌশলের বিচারে কার্যকর সমস্ত উপকরণ তাদেরকে সঙ্গ দিতে শুরু করে। তা থেকে এই যথার্থ আশংকা বৃদ্ধি পায় যে, নয়া বিশ্ব ব্যবস্থাকে তাৎক্ষণিক ভাবে এবং পূর্ণ শক্তিতে বলবত করা না গেলে গোটা পাশ্চাত্য ব্যবস্থা চিরতরে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে।

ব্যাখ্যা

একথাটা এতটা সাদাসিদাও নয় যে, আমরা গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা না করেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবো। এসব বিষয় ব্যাখ্যায় আমার জানামতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পাওয়া যায় আর্নল্ড জে টয়েনবীর নিকটে, যিনি এই লেখকের মতে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এর প্রথম ব্যাখ্যাতা। এটা স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি লিখেন।

The main Strand is the progressive erection, by Western hands, of a Scaffolding within which all the once seperable Societies have built themeslves into one.[৫]

- মূল প্রাপ্তি বা কীর্তি পাশ্চাত্যের গড়া সেই সব উন্নয়নশীল ইমারত, যার ছায়ায় দুনিয়ার নানাবিধ সমাজ নিজেদেরকে একই রূপে ঢালাই করে নিয়েছে।

যেন টয়েনবীর মতে ইউরোপ এবং ইউরোপীয় সভ্যতার আসল অর্জন অন্য কথায় পাশ্চাত্যের আবিষ্কার করা বিশ্ব ঐক্য বা Unification of the World কিন্তু এই ঐক্য এতসব কিছুর পরও সেই সব বিষয় বা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় সাধারণত যে দিকে মানুষের মনছুটে যায়। এই বিশ্ব ঐক্য না পাশ্চাত্য জাতির গীর্জা রাষ্ট্র (Parish Pump Politics) না বেসরকারী পুঁজি বিনিয়োগ তথা Private enterprise হিসাবে বিশ্ব জাতির উপর চেপে বসেছে।

But our Western built Scaffolding is made of less durable materials than that. The most obvious ingredient in it is technology and man connot live by technology alone.[৬]

- আমাদের পাশ্চাত্য হাতে গড়া ইমারতের অলিন্দ অপেক্ষাকৃত ক্ষনস্থায়ী উপাদান দ্বারা তৈরী, যার গুরুত্বপূর্ণ অংশ টেকনোলজি। কিন্তু মানুষ নিছক টেকনোলজী দ্বারা বাঁচতে পারে না।

সুতরাং তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতাকে স্থায়িত্ব আর চিরন্তন স্থিতির জন্য কিছু নির্ধারিত এবং অতিরিক্ত পর্যায় অপরিহার্য ভাবে অতিক্রম করতে হবে। সুতরাং পাশ্চাত্যবাসীর কর্তব্য হচ্ছে তারা নতুন

সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করুক এবং নতুন ময়দান খুলুক, যাতে চিরন্তন স্থায়িত্ব এবং অপ্রতিহত শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করতে পারে। কতিপয় অপরিহার্য বিষয় চিহ্নিত করতে গিয়ে তিনি লিখেন যে পাশ্চাত্যের জন্য এছাড়া কোন উপায় নাই যে, সে আপন ব্যাপকতর স্বার্থের প্রেক্ষাপটে মানবীয় বিষয়ের আকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দুকে (Locus of the centre of gravity of human affairs) নতুন করে এবং নিজের অবিকল ইচ্ছানুযায়ী নির্ধারণ করবে। তার ধারণা মানবীয় বিষয়ের আকর্ষণ কেন্দ্রের সূচনা বিন্দু চিহ্নিত করণের কাজ প্রাকৃতিক ভূগোল নয়, বরং মানবীয় ভূগোল করে। এ কারণে টয়েনবী স্পষ্ট ভাষায় একথা বলেন যে, পাশ্চাত্যবাসী এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও দর্শনের পতাকাবাহীদের নিকট এছাড়া কোন উপায় নেই যে, তারা মানবীয় ভূগোলে এক বিশেষ পরিবর্তন সাধন করবে, যাতে তার উক্তি অনুযায়ী ডা. গামা পূর্ববর্তী Pre-da-gaman চোরাবালি থেকে বের করে আনতে পারে পাশ্চাত্যকে।

মূলত টয়েনবীর পরিভাষা ডা. গামা পরবর্তী এক প্রহেলিকা, বরং অনেকাংশে রহস্যময়। এমনিতেই স্বভাবত তাঁর ব্যবহৃত পরিভাষার অর্থে বেশ জটিলতা ও দুর্বোধ্যতা থাকে। সে সবের গভীরে থাকে তার অর্থ।

আমরা যখন টয়েনবীর পরামর্শের আলোকে মানবীয় বিষয়ের আকর্ষণ কেন্দ্রের সূচনা বিন্দু নিয়ে চিন্তা করি তখন তাৎপর্যের কয়েকটি স্তর চোখে পড়ে। টয়েনবী ছিলেন মৌলিক ভাবে ইতিহাসবেত্তা দার্শনিক। এ কারণে তার বক্তব্য ঐতিহাসিক কিন্তু দার্শনিক ধরণের হয়ে থাকে, তার উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌছা এবং মানবীয় বিষয়ের আকর্ষণ কেন্দ্রের সূচনা বিন্দু জানার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে তার নিম্নোক্ত বক্তব্য ভালভাবে প্রণিধান করা। তিনি লিখেন-

In an air age the locus of the centre of gravity of human affairs may be determined not by physical but by human geography: not by the lay-out of Oceans and Seas, steppes and deserts, rivers and mountain-ranges, passes and Straits, but by the distribution of human numbers, energy, ability, skill and character.[৭]

হাওয়াই জাহাজের যুগে মানবীয় বিষয়ের আকর্ষণ কেন্দ্রের সূচনা বিন্দু

নির্ধারণ করা প্রাকৃতিক ভূগোল দ্বারা নয়; বরং মানবীয় ভূগোল দ্বারা হবে। সাগর উপসাগর, ঘাসে ভরা প্রান্তর এবং বালুকাময় মরু ভূমি, নদী-নালা, আর পাহাড় পর্বত, গিরিপথ এবং প্রণালীর বাহ্য গঠনের ভিত্তিতে নয় বরং মানুষের সংখ্যা, শক্তি, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং চরিত্র বন্টনের ভিত্তিতে।

তিনি আরও লিখেন ঃ

And, among these human factors, the weight of numbers may eventually come to count for more than its influence in the past.[৮]

- এবং মানবীয় উপকরণের মধ্যে সংখ্যার ওজন (ভবিষ্যতে) অতীতে তার গুরুত্বের চেয়ে বেশি কার্যকর হবে।

ভূ-রাজনীতি (Geo-Politics)

ইতিপূর্বে নিবেদন করা হয়েছে যে, টয়েনবী মনে করেন মানবীয় বিষয়ের আকর্ষণ কেন্দ্রের সূচনা বিন্দু প্রাকৃতিক ভূগোলের পরিবর্তে মানবিক ভূগোল দ্বারা নির্ণয় করা হয়। তার এই কথার তাৎপর্য আরও ভাল করে বুঝার জন্য ইতিহাস থেকে দূরে সরে গিয়ে ভূ-রাজনীতির চারজন বিশেষজ্ঞের দর্শন পর্যালোচনা করে দেখা যায়। বিগত একশত বৎসরে গোটা পাশ্চাত্য উপনিবেশবাদ এই চারজন বিশেষজ্ঞের চিন্তার প্রতিধ্বনি ছিল। এরা হচ্ছেন মাহান, মেকান্ডার, হাউসফার এবং স্পাডিকমান। ক্যাপ্টেন আলফ্রেড মায়ার মাহান, ১৮৯০ সালে প্রকাশিত স্বীয় গ্রন্থ (The influence of Sea Power upon the history, 1600-1783) লিখেনঃ

Who rules eastern Europe commands the Heartland, Who rules the Heartland commands the World-Island (Eurasia-Africa). Who rules the World-Island commands the World.[৯]

- পূর্ব ইওরোপে যার কর্তৃত্ব চলে, তার কর্তৃত্ব হার্টল্যান্ডেও চলে, আর হার্টল্যান্ডে যার কর্তৃত্ব চলে সে কর্তৃত্ব করে বিশ্ব দ্বীপে (অর্থাৎ ইউরোশিয়া-আফ্রিকা), আর ইউরো এশিয়া এবং আফ্রিকায় যার কর্তৃত্ব চলে, সারা বিশ্বে তার কর্তৃত্ব চলে। হালফ্রোর মিকান্ডার (১৮৯৬-১৯৪৭) তার নিবন্ধ (The Geographical Pivot of History) তথা ইতিহাসের

ভৌগোলিক খুটি গ্রন্থে রয়্যাল জিওগ্রাফি সোসাইটি লন্ডনে ২৫ জানুয়ারী ১৯০৪ সালে পঠিত) অতঃপর তদীয় গ্রন্থে Democratic Ideals and Reality : New York: Holt, 1919 যেসব মত ব্যক্ত করেছেন তার সার কথা এইঃ "Heartland যা ভলগা নদী, উত্তর মেরু সাগর, ইয়াংশী নদী এবং হিমালয় পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত, ভৌগোলিক দিক থেকে সারা পৃথিবীতে পরিব্যপ্ত হয়ে আছে সুতরাং রাজনৈতিক অঙ্গনে তার শ্রেষ্ঠত্ব থাকবে। বরং রাজনৈতিক দিক থেকে তার স্থান হবে অপ্রতিরোধ্য। কারণ বিশ্ব রাজনীতি শেষ পর্যন্ত মহাদেশ আর সামুদ্রিক জাতির মধ্যে সংঘাতের নাম আর Heartland সামুদ্রিক শক্তি থেকে নিরাপদ অঞ্চল।"

যদিও 'মাহান এবং মেকান্ডার- এর উপস্থাপিত তত্ত্ব পরস্পর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও বিপরীতমুখী উপকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত, এতদসত্ত্বেও উভয়ে কম-বেশী একই ফল আহরণ করে আর তা হচ্ছে Heartland এর কর্তৃত্বের দর্শণ। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় দ্বীপ আফ্রিকা এবং ইউরেশিয়া আয়ত্তকারী কোন শক্তি সারা বিশ্বে অপ্রতিরোধ্য না হয়ে পারেনা।[১০]

নিকোলাস জে স্পাইকম্যান মূলত মেকান্ডার দর্শনের আংশিক সংশোধন করে নির্দিষ্ট ভাবে মেকান্ডারের Heartland এর সঙ্গে যুক্ত অবিকল দক্ষিণ অঞ্চল যা আনুমানিক ৩০ এবং ৪০° উত্তরে দেশের প্রস্থের মধ্যে অবস্থিত, তাকে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা বলে অভিহিত করতেন। তিনি তার নাম রেখেছেন Rimland, Inner or Marginal Crescent

তিনি লিখেন: Who controls Rimland rules Eurasia; who rules eurasia controls the destinies of the World.[১১]

উপরোক্ত বিশেষজ্ঞদের বিপরীতে টয়েনবী প্রাকৃতিক ভৌগোলিক বিষয়ের চেয়ে বেশি মানবীয় এবং সামাজিক ভূগোলের দিকে দৃষ্টি দেন। মানবীয় এবং সামাজিক ভূ-গোলের পরিপ্রেক্ষিতে তার দৃষ্টির কেন্দ্র বিন্দু মেকান্ডারের Heartland এর দক্ষিণ অঞ্চল এবং স্পাইকম্যানের Rimland এর উত্তরাঞ্চলের সমন্বয়ে গঠিত।

মনে হয় টয়েনবী যখন পাশ্চাত্যকে Per-da-gaman যুগ থেকে বের করার কথা বলেন তখন এর অর্থ হয় একদিকে মধ্য যুগীয় ইউরোপের কোকন মনস্তত্ব (Cocoon Psychology) অপর পক্ষে After-Da-gaman সামুদ্রিক মানসিকতা থেকে বের করে এমন স্থানে

দাঁড় করান, যেখানে পৌঁছে কোন জাতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে যায়।

টয়েনবী এসব মত ব্যক্ত করেন ১৯৪৭ সালে। মনে হয় যে ১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা টয়েনবীর চিন্তাধারার বাস্তব প্রতিফলন ছিল অথবা তার বক্তৃতা ছিল ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা। সময় এখন স্পষ্ট ভঙ্গিতে একথার সাক্ষ্যদান শুরু করেছে যে, ইসরাইল নিছক একটা রাষ্ট্রই নয়, ইহুদী বাদ বা খৃষ্টবাদের আশ্রয়স্থল নয়, বরং ইসরাইল রাষ্ট্র হচ্ছে খৃষ্টবাদ ও ইহুদীবাদের সৃষ্ট বিশ্ব ব্যবস্থার রাজধানী এবং তাগুতী খিলাফতের কেন্দ্রস্থল।

ইসরাইলের বিলুপ্তি

বিশ্বের মুসলমানদেরকে একথা ভালভাবে বুঝতে হবে যে, ইসরাইলের বিলুপ্তি সহজ নয়। যারা আশা পোষণ করে যে, সমকালীন ব্যবস্থার অধীনে ইসরাইল রাষ্টের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে সমঝোতা সম্ভব বা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ফিলিস্তীনের অধিকার পূনর্বহাল হবে এবং মসজিদে আক্বসা মুক্ত হবে, তারা স্বপ্নের রাজ্যে বাস করছে। ইসরাইল হচ্ছে তাগুতী খিলাফতের প্রাণকেন্দ্র, নিরাপদ এলাকা (?) এবং কেবলা। বরং এর সঠিক স্থান বায়তুল্লাহর বিপরীতে বায়তুশ শয়তানের। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত পাশ্চাত্যের শয়তানদের দেহে প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ ইসরাইল টিকে থাকবে। ইসরাইল কাল্পনিক কাহিনীর সেই তোতা পাখির মত, যার মধ্যে দৈত্যের প্রাণ আছে। পাশ্চাত্য আর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাণ আছে ইসরাইলের মধ্যে।

নয়াবিশ্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এমনসব ধ্যানধারণার প্রতি ইঙ্গিত করা তেমন অপ্রাসঙ্গিক হবে না যার সম্পর্কে সাধারণ জনমত এই যে, উপসাগরীয় যুদ্ধের ক্ষেত্রে এগুলো হচ্ছে পাশ্চাত্যের অভিপ্রায়ের ভূমিকা যা প্রকাশ করেছেন প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ বার্নাড লিউস (Bernand Lewis) যিনি ছিলেন ইসলামিয়াত ও প্রাচ্যবিদ্যার প্রফেসার এ্যানেনবার্গ ইন্সটিটিউট, ফিলাডেলফিয়া (Annenberg Institute, Philadelphia)। উক্ত ইন্সটিটিউটে জেফারসন লেকচার প্রদানকালে ২মে ১৯৯০ অতঃপর ষ্ট্যান্ডফোর্ড ইউনিভার্সিটি পাওলো আলটো (Stanford University Paolo Alto) -তে বক্তৃতা কালে তিনি এসব মত ব্যক্ত করেন। তার বক্তব্যের সারবস্তু এই যে, বিশ্বের জনসংখ্যার এক প্রঞ্চমাংশ (অর্থাৎ মুসলমান) পাশ্চাত্য এবং বিশেষ করে আমেরিকা ও পাশ্চাত্য ব্যবস্থার

দুশমন। সম্ভবত এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, পাশ্চাত্যের জীবনের গ্যারান্টি এই এক পঞ্চমাংশকে ভালভাবে নিস্পেষিত করা এবং তাদের শক্তির কেন্দ্রের উপর নিজেদের সরাসরি আধিপত্য বিস্তারের মধ্যে নিহিত রয়েছে। এধরনের মত প্রকাশ করেছেন জুলাই মাসের ১ম দিকে আমেকিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট ডন কোয়েলও।

প্রাসঙ্গিক ভাবে একথা বলে রাখা প্রয়োজনীয় মনে হয় যে, মুসলিম উম্মাহ তার ইতিহাসে অত্যন্ত নাজুক কাল অতিক্রম করছে। ধনী আরব দেশগুলোর শাসনকর্তাদের নির্বুদ্ধিতা আর বিলাসিতা এই নাজুকতাকে আরও বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। বর্তমান সময়টা ধ্বংসকারিতার বিবেচনায় তাতারী বিপর্যয়ের চেয়ে শত শত গুণ বেশি তীব্র। এহেন পরিস্থিতিতে উম্মতের প্রতিটি শ্রেণীকে দায়িত্ব নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। সমস্ত আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে এবং সমস্ত মতভেদ মুছে ফেলে উম্মত যদি অবিলম্বে ঐক্যবদ্ধ এবং সারিবদ্ধ হতে না পারে এবং নিজেদের সমস্ত উপকরণ প্রয়োগ করে পাশ্চাত্যের যে কোন ভেল্কিবাজী থেকে নিজেদের মুক্ত করে পাশ্চাত্যের সয়লাব রোধ করার চেষ্টা না করে, তাহলে উম্মতের অস্বাভাবিক পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার সমূহ আশংকা রয়েছে, যা থেকে শত শত বছরেও উদ্ধার পাওয়া যাবে না। এই নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা বর্তমানে যাকে সম্প্রসারিত করা হচ্ছে তা ছুটে আসছে একটা বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের মত; যার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে মুসলিম মিল্লাত এবং ইসলামের ইতিহাস ও তমদ্দুনের কেন্দ্র গুলোকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা।

নয়া ইবলিসী ব্যবস্থা

এই আলোচনা প্রসেঙ্গ আর্নল্ড টয়েনবীর একটা দীর্ঘ উদ্ধৃতি উল্লেখ করা বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয় মনে হয়। এ থেকে হয়ত অনুমান করা যাবে যে, নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা কোন্ সব সর্বাত্মক পরিবর্তন আনয়ন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, এই সব পরিবর্তনের পর মুসলিম উম্মাহর পরিণতি কি দাঁড়াবে, তাও ভালভাবে অনুমান করা যায়।

টয়েনবী লিখেন ঃ

There gravitational Pull may then draw the centre

point of human affairs away from an Ultima Thule among the Isle of the Sea to some locus approximately equi-distant from the western pole of the world's population in Europe and North America and its esatern pole in China and India, and this would indicate a site in the neighbourhood of Babylon on the ancient portage across the isthmus between the continent and its peninsulas of Arabia and Africa. The centre might even travel farther into the interior of the continent to some locus between China and Russia (The two historic tamers of the Eurasian Nomadfs) and that would indicate and site in the neighbourhood of Babur's Farghana, in the familiar Transoxianian meeting-place and debating ground of the religions and philosophies of India, China, Iran, Syria and Greece.[১২]

- এসবের প্রচন্ড আকর্ষণ তখন মানবীয় বিষয়ের কেন্দ্রীয় ঐক্য বিন্দুকে জাযিরা আল বাহরের মধ্যে অবস্থিত আলটিমা থিউল (Ultima Thule) থেকে টেনে এনে সেই স্থানে দাঁড় করাবে, যা উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের জনপদের পশ্চিম মেরু এবং ইন্দোচীনে অবস্থিত পূর্ব মেরুর অভ্যন্তরে রয়েছে এবং এটা করে ব্যাবিলনের পার্শ্ববর্তী এমন এক এলাকার প্রতি ইঙ্গিত করে, যা মহাদেশ এবং তার আরব আফ্রিকান উপদ্বীপের সংযোগ স্থলের ওপারে প্রাচীন কাল থেকে পরিবহন স্থল হিসাবে পরিচিত। হতে পারে সেই কেন্দ্র মহাদেশের আরও ভিতরে চলে যাবে, যেখানে চীন এবং রাশিয়া (ইউরোশীয় যাযাবরদের দু'টি দল) পরস্পর মিলিত হয়। আর তা ইঙ্গিত করে এমন এক স্থানের প্রতি, যা বাবরের ফরগানার আশপাশে মা-ওরাউন নাহরের সেই স্থান, যা হিন্দুস্থান, চীন, ইরান সিরিয়া এবং গ্রীসের ধর্ম এবং দর্শনের কেন্দ্র ছিল এবং চিন্তা-গবেষণার কেন্দ্রস্থল হিসাবে পরিচিত ছিল।

মৌলিক পরিবর্তন

নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা যে তার পতাকাবাহীদের জন্য সর্বগ্রাসী এবং মৌলিক পরিবর্তনের সংকল্প নিয়ে উত্থিত হয়েছে- একথা অনুমান করার জন্য উপরের বিষয়গুলো যথেষ্ট। এ পর্যন্ত যা আলোচনা করা হয়েছে, তা ছিল ঐতিহাসিক, সামাজিক, ভৌগোলিক এবং কৌশলগত এবং তা উল্লেখ করা হয়েছে নিছক বুঝানোর খাতিরে। অন্যথায় এর ব্যাপকতা মানব সমাজের সমুদয় বিষয়কে গ্রাস করে আছে।

বিশ্বে এমন ৮টি বৈশিষ্ট্য আছে, যা নানা জাতির উত্থান-পতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এসবের মধ্যে কিছু কিছু আছে স্থায়ী এবং প্রাকৃতিক আর কিছু কিছু আছে অস্থায়ী এবং অর্জিত। বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে মানবীয় উন্নতি শেষ স্তরে উপনীত হয়েছে যেখানে ভূমি, সমুদ্র, বায়ু এবং পৃথিবীর নিকটবর্তী মহাকাশে মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও এসব বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোন পরিবর্তন সূচিত হয়নি, যেগুলোকে পূর্বেও গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক বলে স্বীকার করে নেওয়া হত। সে ৮টি মৌলিক বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হল। -

(১) শক্তির ভারসাম্য

(২) ভূগোল, ভৌগোলিক রাজনীতি, ভৌগোলিক কর্মকৌশল।

(৩) জনসংখ্যা।

(৪) কাঁচামাল এবং প্রাকৃতিক সম্পদ

(৫) অর্থনীতি এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি।

(৬) কারিগরি দক্ষতা।

(৭) সামরিক শক্তি।

(৮) নেতৃত্ব

নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা উপরোক্ত সমুদয় বিষয়ে অপরের কোন অংশিদারিত্ব ছাড়া একচ্ছত্র দখলদারিত্বের অপর নাম। এই ব্যবস্থা যার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে এবং যার সম্প্রসারণ ও সুদৃঢ় করণের সংগ্রামে পাশ্চাত্য আদা-নুন খেয়ে লেগেছে, তা হবে এমন এক সর্বগ্রাসী ব্যবস্থা, যাতে অন্যান্য ব্যবস্থার এক একটি আলামতকে এবং এক একটি চিহ্নকে বিলুপ্ত করে ইতিহাসের অংশে পরিণত করা হবে। বিগত ৪৫ বছর ধরে এই ব্যবস্থার লালন-পালন চলছে,

যার জন্য পাশ্চাত্য এবং বিশেষ করে এ্যাংলো, স্যাক্সন জাতি কমপক্ষে ৪টি পদ্ধতি ব্যবহার করছে। নানা কারণে তারা এতে সফল হয়েছে। দুনিয়া এবং বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহ্ তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে পারেনি। নয়াবিশ্ব ব্যবস্থা উপস্থাপনার ৪টি ব্যবহৃত পদ্ধতি ঃ

(১) প্রাতিষ্ঠানিক (Institutional) পদ্ধতি।

(২) কার্যকর (Functional) পদ্ধতি

(৩) তদারকী (Curative) পদ্ধতি

(৪) পর্যায় ক্রমিক (Step by Step) পদ্ধতি

মার্চ ১৯৯১ এর পূর্বে থেকে ধারণা করা হচ্ছিল যে, নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য পাশ্চাত্য পঞ্চম পদ্ধতি প্রয়োগের প্রস্তুতিতে নিমগ্ন আছে। এই পঞ্চম পদ্ধতি হচ্ছে বহুমুখী পদ্ধতি, যাকে বলা যায় Many Front Approach. পাশ্চাত্য এর প্রয়োজন এজন্য অনুভব করে যে তাদের ধারণা অনুযায়ী, নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার জন্য Disturbing Porces উত্যক্তকারী শক্তিগুলো সংখ্যায় এর অস্বাভাবিক সংযোজন ঘটেছে। এতদসত্ত্বেও এই পদ্ধতি অবলম্বনের নিকটতর সময় ১৯৯৪ বা ৯৫ পরবর্তী কালীন হতে পারে। কিন্তু মনে হচ্ছে উপসাগরের বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পাশ্চাত্য ১৯৯৫ সালের অনেক আগেই এই পদ্ধতি অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আগামী দিনের খসড়া

দ্বিতীয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ঃ নয়াবিশ্ব ব্যবস্থা কোন্ আকারে প্রকাশ পাবে? তার অবয়ব আকৃতি কেমন হবে? এই ব্যবস্থার অবয়ব সম্পর্কে বলা চলে, তাতে শুরুতে দুটো বিষয় সুস্পষ্ট হবে বলে মনে হয়। কিন্তু এদুটোই তার অবয়ব হবে, এমনটি জরুরী নয়। এদুটো বিষয় মূলত সে ব্যবস্থার অন্তর্বর্তী কালের পরিচয় হবে। তার সত্যিকার অবয়ব সম্পর্কে ধারণা করা এখনও কঠিন, অর্ন্তবর্তী কালের পরিচয় দুটো বিষয় এমনই উজ্জ্বল হবে যে তাকেই মূল বৈশিষ্ট সাব্যস্ত করা যাবে। সে দুটো বিষয় হবে এই-

(১) এক মেরু ব্যবস্থা

(২) দীর্ঘ ভারসাম্য

বিংশ শতাব্দী সাধারণত তিন ধরনের ব্যবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে।

এক মেরু ব্যবস্থা 'দুই' মেরু ব্যবস্থা এবং বহু মেরু ব্যবস্থা। বর্তমানে এক মেরু ব্যবস্থা পূর্বের তিনটি ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন এবং সর্বব্যাপী।

এক দুই বা দু'য়ের অধিক শক্তির অভ্যন্তরে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা মৌলিক ভাবে বহুবিধ শক্তির আকর্ষণ-বিকর্ষণ, (Pull and Strain) এর ভিত্তিতে স্থাপিত হয়। মানব ইতিহাসে যদি কখনও এমন হয় যে, সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং কেবল একটি টিকে আছে তখনও এক অদৃশ্য বা কাল্পনিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ (Strain) যথাযথ ভাবে বহাল থাকবে যা অতি দ্রুত অপর মেরুর রূপ ধারণ করবে। আলোচ্য এক মেরু ব্যবস্থা হবে এর ব্যতিক্রম। মানব জীবনে ব্যক্তিগত সামাজিক এক মেরু ব্যবস্থা সকল বিভাগে এমন সর্বব্যাপক প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সংমিশ্রণ ও সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা হবে। যাতে এক মেরু পরিস্থিতি হওয়া সত্ত্বেও কোন প্রকার কাল্পনিক দ্বন্দ্ব বিদ্যমান থাকার প্রশ্নই উঠেবে না। এই বিবেচনায় এই নয়া ব্যবস্থার মূল সাফল্য কোন এক মেরুর কর্তৃত্ব লাভ নয়; বরং মানব জীবনের সকল বিভাগের উপর সেই মেরুর কর্তৃত্ব এবং তার সর্ব ব্যাপকতাই সাফল্যের মূলকথা।

এই নয়া ব্যবস্থার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য তার দীর্ঘ ভারসাম্য। এই ব্যবস্থার ধারক-বাহকরা প্রাথমিক অন্তবর্তীকাল সম্পর্কে এ মত পোষণ করে যে, তাদেরকে অন্যান্য ব্যবস্থার প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে। বিশেষ করে ইসলামী ব্যবস্থার প্রতিরোধ। তারা এ ধারণাও পোষণ করে যে, সকল প্রতিরোধ ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়বে। এমনকি শেষ পর্যন্ত একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে। এর কারণ এই হবে যে, কিছু কাল পর নয়া ব্যবস্থার ব্যাপকতা তাকে পুরোপুরি অকার্যকর (Neutralise) করে ছাড়বে। বিরোধী ব্যবস্থার উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হবে। ইতিপূর্বে নিবেদন করা হয়েছে যে, বিশ্বের বুকে এমন ৮টি বৈশিষ্ট রয়েছে, যা শ্রেষ্ঠত্বের জন্য সিদ্ধান্তকর ভূমিকা পালন করে। এসবের মধ্যে কিছু হচ্ছে প্রাকৃতিক এবং কিছু অর্জিত। সুতরাং শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন এবং তা ধরে রাখার জন্য নিম্নোক্ত চারটি পদ্ধতি সম্মুখে আনা প্রয়োজনীয় মনে করা হয়েছে। সে পদ্ধতিগুলো এই ঃ

(১) কোন বিষয়ের উপরিভাগে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

(২) এমন কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ, যেগুলো অধিকার করা সম্ভব, তা অধিকার

করে নেওয়া।

(৩) এমন কিছু প্রাকৃতিক এবং অর্জিত সম্পদ, যেগুলো অধিকার করা সম্ভব নয়, সে গুলোকে বিনাশ করে দেওয়া।

(৪) কিছু অর্জিত বিষয় এবং উপকরণ, যেগুলোর ক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যবস্থা প্রতিযোগিতা চালাতে পারে, যে কোন মূল্যে সে গুলোকে ধ্বংস বা ব্যর্থ করে দেওয়া।

এই বিবেচনায় দুনিয়া এবং জীবনের প্রতিটি বিভাগে মেরু ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, সম্প্রসারণ এবং স্থায়িত্ব আর উপরি কর্তৃত্ব অর্জন এবং তা ধরে রাখার জন্য অপরিহার্য হচ্ছে, পাশ্চাত্য যেন নিচের বিষয় গুলোকে নিজের জন্য নিশ্চিত করে নেয়।

(১) জীবনের সকল বিভাগে ক্রমবিকাশমান কারিগরি দক্ষতা (Technological Expertise) এর উপর পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা।

(২) বিশ্বের সমুদয় বস্তুগত এবং অবস্তুগত সম্পদের উপর সরাসরি দখল প্রতিষ্ঠা।

(৩) উৎপাদনের সকল উপায়-উপকরণের উপর সর্বগ্রাসী কর্তৃত্ব।

(৪) বিশ্বের সকল স্তরে যে কোন ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ।

(৫) জল-স্থল, অন্তরীক্ষ, সবরকম যাত্রাপথ সরাসরি নিয়ন্ত্রণ।

(৬) বিশ্বে যেকোন স্তরে বর্তমান উপায়-উপকরণ ও যোগাযোগ মাধ্যমের উপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ।

(৭) বিশ্বে সকল স্তরে প্রাপ্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার উপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ।

তাগূতী খিলাফত এসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য চূড়ান্ত সংগ্রাম চালাচ্ছে। তার সৈন্যরা মুসলিম মিল্লাত ছাড়া প্রায় সারা বিশ্বকে পদানত করেছে। বস্তুত মুসলিম মিল্লাত ছাড়া সত্যিকার অর্থে তাদের অন্য কোন প্রতিপক্ষ নেই। কারণ উপরোক্ত ৮টি বৈশিষ্ট্যে কেবল মুসলিম মিল্লাতই আশংকার কারণ হতে পারে। ইসলাম এবং ইসলামী মিল্লাতের সঙ্গে তাদের সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হয়েছে। এটাই হচ্ছে সে কথা, যার দিকে ইঙ্গিত করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ। তিনি বলেন ঃ

আমরা সর্বশেষ এবং সিদ্ধান্তকর যুদ্ধ লড়ছি। আমরা লড়ছি সারা বিশ্বের পক্ষ থেকে। (স্টেটসম্যান, কোলকাতা, ফেব্রুয়ারী ১৯৯১)

টীকা ঃ

১. Arnold J. Toynbee; Civilisation On Trial. London 1974.

২. আল্লামা ইকবাল, যমানা, বালে জিবরীলঃ

جہان نوہو رہا ہے پیداوہ عالم پیر مر رہاہے

جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیاہے قمار خانہ

৩. Max Lerner; The Age of Overkill: A preface to World Politics (New York : Simon and Schuster, 1962 P.10)

৪. Dag Hammarskjold; Perspective on Peace, 1910-1960 (New York: Frederick A. Praeger, For the Carnegie Endowment for International Peace, 1960) P-65

৫. A.J. Toynbee; Civilisation on Trial, London 1948.

৬. প্রাগুক্ত

৭. প্রাগুক্ত

৮. প্রাগুক্ত

৯. Capt. Alfred Thyer Mahan; The Influence of Seapower upon History, 1600-1783; Boston: Little, Brown and Company 1890.

১০. Derwent Whittlesey; Haushofer; Geopolitician, in EM Earle, ed: Makers of Modern Strategy (Princeton, N.J: Princeton University Press, 1943) PP 398-406.

১১. Nicholas J. Spykman: The Geography of the Peace; Ed. by Helen R. Nicholl, N.Y, Harcourt, Brace, 1944, PP- 41-43.

১২. A J Toynbee; Civilisation On Trial, London 1948